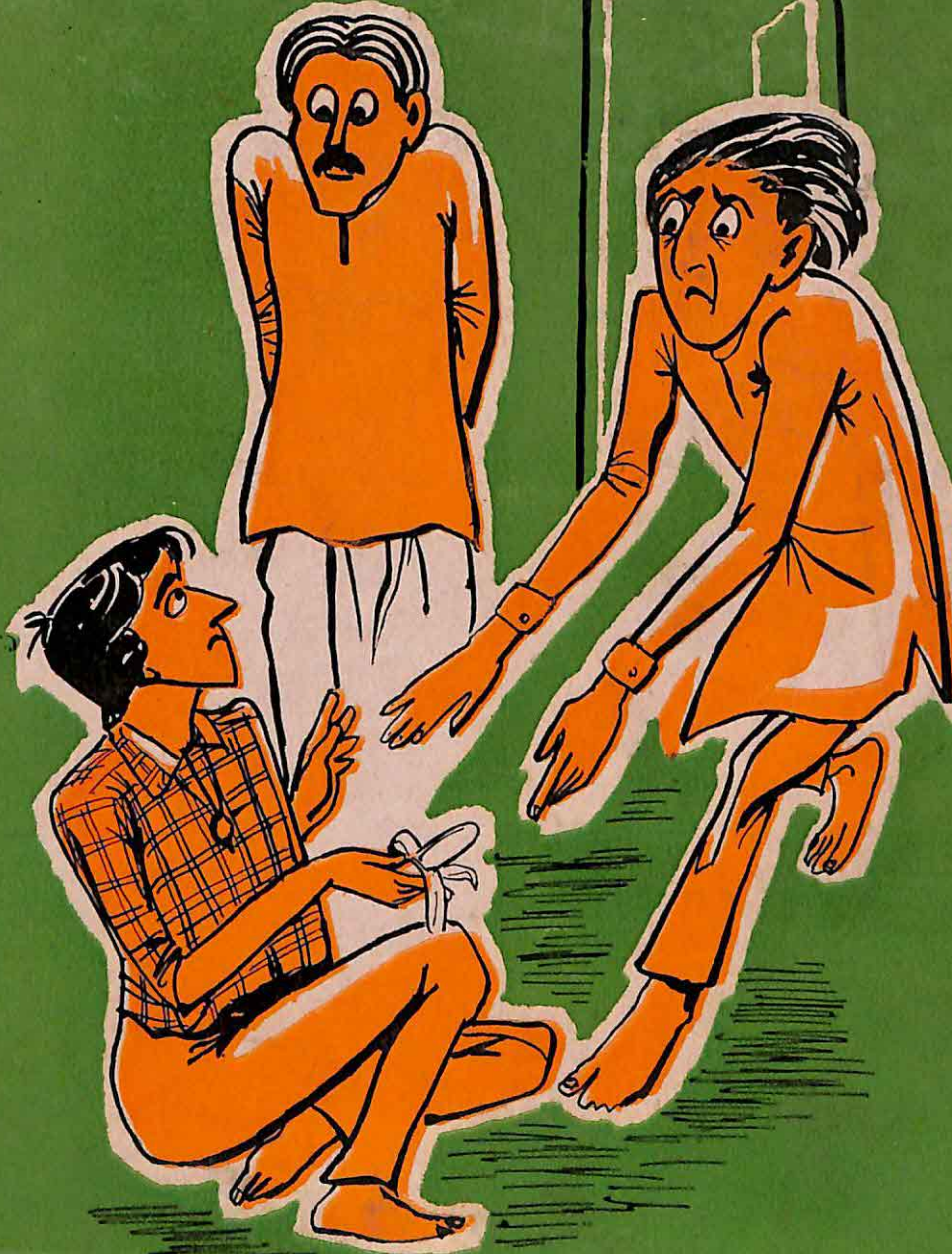
অলৌকিক



অলৌকিক

অধ্যাপক সুনির্মল রায়

মালা পাবলিকেশন্‌স্‌
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রকাশক :
আশিস্‌কুমার বর্দ্ধন
মালা পাবলিকেশন্‌স্‌
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা-৭০০০৩৬

প্রথম প্রকাশ :
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৯৪
মে, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ :
দেবাশীষ পাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
সমরদে
পীযুষ রায়
বিশ্বনাথ দাস

মূল্য : আট টাকা

মুদ্রাকর :
বঙ্কিম চন্দ্র পাল
নিউ পাল প্রিন্টার্স
৬৭/এ, ডবলু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
মালা পাবলিকেশন্‌স্‌
৪, নিমাই বোস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

আই. পি. পি. কোং (প্রাঃ) লিঃ
৫৭/সি কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশকের কথা

অধ্যাপক সুনির্মল রায় আজ ছোট-বড় সবাই-এর কাছে জনপ্রিয় লেখক। কারণ তাঁর লেখার মধ্যে সব-সময় থাকে ৪টে প্রয়াসের সংমিশ্রণ (১) বিজ্ঞান (২) বুদ্ধি (৩) রস (৪) সাহিত্য। আর বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকে নানা বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণ। তাঁর লেখা "ভিন্‌গ্রহে মানুষ গোয়েন্দা" বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান নির্ভর গোয়েন্দা উপন্যাস।

ইতিমধ্যেই তিনি রাষ্ট্রীয় সম্মান, জাতীয় পুরস্কার, আশুতোষ পুরস্কার এবং আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন।

আমার আশা ভবিষ্যতে আরও-আরও পুরস্কার তিনি পাবেন এবং পাঠকদেরও অনেক নতুন-নতুন বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার উত্তর গল্পের মাধ্যমে দিয়ে যাবেন।

সূচীপত্র

অলৌকিক

মন যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু যা নিজের চোখে দেখেছেন তাই বা অবিশ্বাস করেন কি করে। মিস্টার চাকলাদারের মনে আজ এক দারুণ আলোড়ন চলেছে।

এক আশ্চর্য চরিত্র চাকলাদারের। ভূত মানেন না, ভগবান মানেন না, মানেন শুধু বিজ্ঞানকে। পায়জামা পাজ্ঞাবী বেশী পরেন। হাতে সবসময়েই একটা লাঠি। সুন্দর কাজ করা। মুখে চুরুট। বয়স বোঝা মুশকিল। চল্লিশ থেকে ষাট, যে কোন একটা হতে পারে।

ভদ্রলোক মাস তুয়েক হোলো এসেছেন বারাসতে। আছেন একটা হোটেলে। ভদ্রলোক কি চাকরি করেন বা আদৌ করেন কি না, তা সঠিক করে কেউ কিছু বলতে পারেন না। কারণ মোটেই আলাপী নন তিনি। যে তু'চারজনের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, তাদের সঙ্গেও সবসময় কি রকম একটা ব্যবধান রক্ষা করে চলেন।

কেউ কেউ বলেন ভদ্রলোক বর্মায় চাকরি করতেন। সংসারে একদম একা। রিটায়ার্ড হয়ে ভারতে এসেছেন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে। তবে বারাসতে স্থায়ীভাবে থাকবেন কি না এ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। ভদ্রলোকের হাতে যে বেশ কিছু পয়সা রয়েছে তা তার খাবার-দাবার, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

এককথায় ওনাকে নিয়ে নানাজনের নানা কথা। তবে ভদ্রলোক যে বেশ জ্ঞানী, বিজ্ঞানে যে তার অসাধারণ জ্ঞান রয়েছে, এ বিষয়ে সমস্ত বারাসতবাসীই একমত। বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন

কথা তার মুখে আসে না। ভূত বা ভগবান মানেন না এবং অলৌকিক কাহিনীতে আদৌ বিশ্বাসী নন।

পুরো নাম সুভাষ চাকলাদার। মিস্টার চাকলাদার বলেই পরিচিত। যে চাকলাদারের সামনে লোকে ভূতের কথা বলতে ভয় পায়, ভগবানকে ডাকতে লজ্জা পায়—সেই চাকলাদারের আজ কি হোলো। বার বার ভগবানের নাম করছেন। অলৌকিক শক্তিতে হঠাৎ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন।

ঘটনাটা তাহলে খুলেই বলি। আজ দুপুরেই ঘটেছে। এর একটা ভূমিকা রয়েছে এবং ভূমিকা না বললে এ ঘটনার গুরুত্ব ঠিক বোঝা যাবে না।

অনেকদিন অনেকের মুখে মিস্টার চাকলাদার এই সাধুর নাম শুনেছেন। সাধুর নাম লালবাবা। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যেন হইচই তুলেছেন ইনি। রাতারাতি সবাই এর ভক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফটো বিভিন্ন জায়গাতে কিনতে পাওয়া যায়। যত বড় নাস্তিকই এই ফটোর সামনে আসুক না কেন, ফটোর সামনে আসামাত্রই তার মনে একটা অদ্ভুত ভগবৎ-বিশ্বাস জন্মে, আর মনে হয় লালবাবা বুঝি অবতার। লালবাবার ফটো সমেত লকেট এবং আংটিও পাওয়া যায়। যারা এটা সঙ্গে সঙ্গে রাখে তাদের সামনে এসে পরম শত্রুও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শত্রুকে ভাবে বন্ধু। ঘরে ঘরে আজ লালবাবার ফটো। গলায় গলায় লালবাবা, হাতে হাতে লালবাবা।

লালবাবা ভগবানের অবতার। অনেকের মুখে শুনেছেন এ কথাটা। 'অবতার ! অবতার না ছাই !' চাকলাদার কিন্তু বার বার এ কথাটাই বলেছেন। বলেছেন, 'যত সব বুজরুকি। ভণ্ডামির আর জায়গা পায়নি।

সেই চাকলাদারই আজ স্বীকার করতে বসেছেন—না, সাধুটার মধ্যে সত্যিই বোধহয় কোনো অলৌকিক শক্তি রয়েছে। অলৌকিক ছাড়া আর কি বলা যায়। নিজের চোখে দেখা অথচ বিজ্ঞানে এর কোনো ব্যাখ্যা নেই।

আজ দুপুরেই ঘটেছে ঘটনাটা। ঘড়িতে তখন দুপুর একটা। মাথার ওপরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। কি একটা কাজে শীতলের বাড়ীতে গিয়েছিলেন চাকলাদার। শীতল বারাসত ইউনাইটেড ক্লাবের মেম্বার। তার কাকার সঙ্গে চাকলাদারের কিছুটা ভাব জমে উঠেছিল। সেই সূত্রেই বাড়ীতে যাতায়াত।

শীতল তখন সবেমাত্র খেতে বসেছে। বিরাট বাড়ী ওদের। আত্মীয়স্বজন বলতে ওর এক কাকা ছাড়া আর এক রাঁধুনী—এই তিনটি মাত্র প্রাণী ওরা। কাকা বিয়ে-থা করেননি। করার বয়েসও পেরিয়ে গিয়েছে। কলকাতায় কিসের ব্যবসা করেন।

সব সম্পত্তির মালিক শীতল। বাবা মারা যাওয়ার সময় এই মা-মরা ছেলেটাকেই সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। কাকার ভাগ্যে কানাকড়িও জোটেনি। কিন্তু তা নিয়ে কাকার কোন দুঃখ নেই। শীতলকে যথেষ্ট স্নেহ করেন তিনি। অন্ততঃপক্ষে শীতলের তাই বিশ্বাস।

খেতে খেতেই চাকলাদারের সঙ্গে কথা বলছিলো শীতল। তার কাকা গতকাল ব্যবসার কাজে কলকাতা গিয়েছেন। আজ দুপুর বারটায় ফেরার কথা। গতকাল কলকাতা যাবার সময় চাকলাদারের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। আজ তাঁকে দুপুর বারটায় এখানে আসতে বলেছেন। কি একটা দরকার আছে চাকলাদারের সঙ্গে।

খেয়েদেয়ে এখানে আসতে একটা বেজে গিয়েছে চাকলাদারের। ভেবেছিলেন দেরী দেখে শীতলের কাকা হয়তো অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু কাকারই পাত্তা নেই। এখন পর্যন্ত ফেরেননি কলকাতা থেকে।

খাওয়া দাওয়া এবং খাদ্যবস্তু সম্পর্কে শীতলের একটা নিয়মানু-বর্তিতা আছে। যেমন রোজ ঠিক বারটার সময় সে খাবে। আর খাবারও নির্দিষ্ট করা। যেমন প্রতিদিন খাবার শেষে দুটো করে কলা তার খাওয়া চাই- চাই। সেজন্য একসঙ্গে ডজনখানেক কলা আনিয়ে রাখেন রাঁধুনীকে দিয়ে।

শীতলের সঙ্গে চাকলাদারের খুব একটা ভাব নেই। কথার

মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন দু'জনে। এক সময়ে সেই নীরব শ্বাসরোধকারী গভীরতায় গভীর হয়ে উঠলো। হঠাৎ চাকলাদারের নজর গেলো শীতলের গলার দিকে। গলায় লালবাবার ফটোসমেত লকেট ঝোলান।

বোধহয় সেই শ্বাসরোধী নীরবতাকে ভঙ্গ করার জন্যই চাকলা-দার বলে উঠলেন, তোমাকেও লালবাবায় ভর করেছে দেখছি।

আর কিছু বিদ্রূপ করতে যাচ্ছিলেন চাকলাদার। করতে গিয়েও কেন জানি থেমে গেলেন। মনে হ'ল নিরীহ ছেলেটাকে বিদ্রূপ করা ঠিক নয়।

ঠিক এমনি সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন শীতলের কাকা। শীতলকে এই অসময়ে খেতে দেখে কেমন হকচকিয়ে গেলেন। মুখ-চোখের ভাব কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

শীতলের খাওয়া তখন প্রায় শেষ। কলার খোসাটা ছাড়িয়ে যেই সে খেতে যাবে, অমনি কাকা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কলাটা শীতলের হাত থেকে ফেলে দিলেন।

বললেন, তোকে আমি মারতে চেয়েছিলাম! এ আমার কি হয়েছিলো! বলে শীতলকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দিলেন।

চাকলাদার তো থ! শীতলও নির্বাক। কিছু বুঝতে না পেরে দু'জনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কাকার দিকে।

'কিছু মনে করবেন না মিস্টার চাকলাদার! আমায় তুই ক্ষমা কর শীতল!' বললেন শীতলের কাকা বিহ্বল ভঙ্গীতে।

বারবার একথা বলতে বলতে কাকা বিশদভাবে যা বললেন, তার মর্মার্থ শুনে চাকলাদারের চক্ষু তো চড়ক গাছ! কাকা নাকি শীতলকে মেরে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার প্ল্যান অনেকদিন ধরেই আঁটছিলেন। কলাগুলোতে আগে থেকেই স্ূচ ফুটিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড ভরে রেখেছিলেন। উপর থেকে সূচের দাগ ছিল বোঝা মুশকিল। সন্দেহটা যাতে চাকলাদারের উপর পড়ে তার জন্য কাকা গতকাল তাঁকে বারটার সময় আসতে বলেছিলেন। কারণ কাকা

জানেন, শীতল রোজ ঠিক বারটার সময় খায়। কাকা ইচ্ছে করেই দেরি করে ফিরেছেন যাতে শীতলের মৃত্যুকালে ঘটনাস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন না বোঝাতে পারেন।

ফিরে শীতলকে দেরি করে খেতে দেখে প্রথমটা তিনি অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন। কিন্তু ঘরে ঢুকে শীতলকে দেখে আর তার গলার লালবাবার ফটোর দিকে দৃষ্টি পড়ায়, হঠাৎ কেন জানি তাঁর মনে হ'ল শীতলের কোনো ক্ষতি করা উচিত নয়। এটা মনে হতেই তিনি কলার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভাগ্যিস শীতল আজ দেরী করে খেয়েছে।

চাকলাদার তখনো ঠিক কাকার কথায় বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। বিশ্বাস হ'ল নীচের কলাটা খেয়ে একটা ইঁদুর সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতে। শীতলকে জিজ্ঞেস করলেন—লকেটটা কাকা আগে দেখেন নি?

—না, আজ সকালেই এটা আর একটা ফটো কিনে এনেছি। লালবাবার ফটো কাছে থাকলে কারো কোনো বিপদ হয় না।

ফেরার পথে চাকলাদারের বারবার শীতলের শেষ কথাটাই মনে হতে লাগল। তবে কি সত্যিই লালবাবা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।

হয়তো তাই। হয়তো তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে অর্থাৎ অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ যে সেটা ইন্দ্রিয় হিসেবেই কাজ করে। যার পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের কোন একটা ধরা যাক চোখ যদি না থাকে তবে সে পৃথিবীকে যেভাবে দেখবে কারো পাঁচটা থাকলে সে পৃথিবীকে স্বাভাবিক কারণেই একটু বেশী করে জানতে পারবে। এরকম কারো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থাকলে অর্থাৎ অনুভূতি প্রখর হ'লে সে পৃথিবীকে আরও একটু বেশী করে জানতে পারবেই। তার বিশেষ ক্ষমতা থাকাও অস্বাভিক নয়। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে অস্থির মস্তিষ্কে দুপুরটা কাটিয়ে দিলেন চাকলাদার। বিকেলবেলা লালবাবার ফটোখানা চেয়ে আনলেন শীতলের কাছ থেকে। লালবাবার প্রতি তার অনেকখানি বিশ্বাস

ফিরে এসেছে। পুরোপুরি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে আর একটু পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন।

শুনেছিলেন লালবাবার ফটোর সামনে বসে একখানা সাদা কাগজ রেখে কেউ যদি পাঁচ মিনিট একমনে তার কথা ভাবে তাহলে সেই সাদা কাগজে লালবাবার একটা ছবি ফুটে ওঠে।

ফটোখানার সামনে একটা সাদা কাগজ রেখে তক্ষুনি চাকলাদার পরীক্ষায় বসে গেলেন। লালবাবার কথা ভাবতে গিয়ে আস্তে আস্তে তার মন কেমন ধ্যানমগ্ন হয়ে উঠলো। চারদিকে একটা শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হ'ল। মনে হ'ল চারদিকে কিছু নেই, শুধু সেই সাদা কাগজটার ওপরে লালবাবার মূর্তিটি ভাসছে। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে তার খেয়ালই নেই।

হঠাৎ শীতলের কাকার ডাকে তার সম্বিৎ ফিরে এলো। চাকলাদারকে এ দৃশ্যে দেখতে পেয়ে কাকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি, আপনিও শেষকালে ওর ভক্ত হয়ে পড়লেন ?

কোন কথা না বলে চাকলাদার ঝুঁকে পড়লেন সাদা কাগজটার ওপর। সত্যিই তো কাগজটার ওপর লালবাবার একটা অস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে।

হ্যাঁ, ভক্তই হলাম তার। তবে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে নয়। অনুভূতি, চিন্তা এরা বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকারে মাথাতে খেলে। এক একটার একরকম তরঙ্গ। এর বহিঃপ্রকাশও হয়। এভাবে মাথার চিন্তার লেভেলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্য লোকের মাথার চিন্তার তরঙ্গে এনে রেডিওর মতো সেই লোকটির মনের কথা বলা সম্ভব। আবার ইচ্ছা তীক্ষ্ণ হ'লে, অনুভূতি প্রখর হ'লে, জোরালো বিদ্যুৎতরঙ্গ পাঠিয়ে অন্য লোকের মাথার তরঙ্গকে প্রভাবান্বিত করা যায়। তখন সেই লোকটির চিন্তা, ভাবনাকে ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শুধু তাই নয়, ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশও সম্ভব। ইচ্ছা জোরালো হ'লে তা রূপ নিতেও পারে। এভাবে জোরালো ইচ্ছার সাহায্যে শূন্যে চামচ ইত্যাদি তোলা যায়। চক্ষুর মণিকে ইচ্ছেমতো চক্ষুর বাইরে

নিয়ে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে আনা যায়। জোরালো ইচ্ছার সাহায্যে নিজের সূক্ষ্ম অস্তিত্বকে বহুদূরে নিয়ে সেখানে কি ঘটছে তা বলে দেওয়া যায়।

'এনার মধ্যে সত্যিই অলৌকিক শক্তি রয়েছে'—বলে ফটোখানা যত্নসহকারে টাঙাতে গেলেন চাকলাদার। টাঙাতে গিয়ে হঠাৎ হাত ফস্‌কে নীচে পড়ে গেলো ফটোখানা। পড়েই চৌচির!

কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন চাকলাদার। বার বার প্রণাম করতে করতে ফটোর ভাঙা টুকরোগুলো কুড়োতে লাগলেন।

*　*　*　*

ঠিক পরের দিনের ঘটনা। চারদিকে রটে গেল চাকলাদার পাগল হয়ে গিয়েছে। বেশ তো লালবাবার ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। রাতারাতি যেমন ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, রাতারাতিই তেমনি পাগল হয়ে গেলেন। লালবাবার ফটোখানা ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই যতো বিপত্তি।

সেদিনই সমীরবাবুর ঘরে গিয়ে চাকলাদার নাকি লালবাবার ফটোখানা নামিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলেন। তারপর কি কুড়িয়ে নিয়ে সোজা হনহন করে বেরিয়ে যান। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলেননি। এরকম ঘটনা অনেক ঘরে গিয়েই নাকি করেছেন চাকলাদার। ঘরে ঘরে গিয়ে লালবাবার ফটো আছড়ে ভেঙ্গে ফেলেছেন। অনেকের মতে এও নাকি লালবাবার কীর্তি। নিজের ঘরে ফটো টাঙাতে গিয়ে সেখানা ফেলে দেওয়ার দোষেই তিনি নাকি পাগল হয়েছেন।

পাগল হয়েছিলেন তাও ভাল। কিন্তু কয়েকদিন বাদে চাকলাদার একেবারে হাওয়া হয়ে গেলেন। কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না তাকে। আসলে বহু ঘরে গিয়ে চাকলাদার লালবাবার ফটো আছড়ে ভেঙে ফেলেছেন। পাগলামো আর কত সহ্য করা যায়। তাও আবার ধর্মকে নিয়ে! এ ধরণের সাধকের ফটো নিয়ে!

মার আসলে খেতেন না। খেলেন গোঁয়ার ছেলে কেষ্টাকে ঘাঁটাতে গিয়ে। কেষ্টার বাবা স্কুলমাষ্টার। কেষ্টার অন্য ভাইটাও বেশ ভাল। কেষ্টাটাই যেন ঘরছাড়া। ছোট্ট বয়স থেকেই লোকের সঙ্গে একদম মেশে না। দু'একটি কুসঙ্গীও জুটেছিল। কেমন যেন একগুঁষে, যা বলবে তাই করবে। আসলে অভাবের সংসার। বাবা মার স্নেহ ভালবাসাও একদম পায়নি কেষ্টা। বয়স বেশী নয়, পনেরো। তবে এরি মধ্যে লোকের ঘেন্না, উপহাস কম সইতে হয়নি তাকে। কেষ্টার বাবা শেষকালে লালবাবার ফটোসমেত একটা লকেট পরিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের গলায়, ছেলে ভাল হবে এই আশায়।

সেই লকেটটাই ছিনিয়ে নিতে গিয়েছিল চাকলাদার। ছিনিয়ে নেওয়াতে প্রথমটা কেমন থ' হয়ে গিয়েছিল কেষ্টা। তারপর যখন সেটা আছড়ে ভেঙ্গে ফেললো—তখনই ঘটলো ঘটনাটা। চাকলাদারের হাতের লাঠিটা কেড়ে দিয়ে দমাদম তার মাথায় ঘা দিতে লাগল কেষ্টা। সঙ্গে সঙ্গে চাকলাদার লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। মাথা দিয়ে রক্ত বেরুনো শুরু করলো। ভাগ্যিস, ব্যাপারটা ঘটেছিলো গ্রামের প্রান্তে কানাপুকুরে। সেখানটিতে দিনের বেলাতেও লোকে যেতে ভয় পায়। চারদিকে ঝোপ, জঙ্গল। বেশ ঘন জঙ্গল।

এতটা হবে বুঝতে পারেনি কেষ্টা। তবে কি মারাই গেলো জ্যেঠু। একদম নড়ছে না!

মাথাটা কিরকম ঘুরতে লাগলো কেষ্টার। চারদিক কিরকম আবছা আবছা লাগছে। জোরে জোরে শ্বাস বইছে তার। পুলিশ জানতে পারলে তার ফাঁসি হবে। ভয়ে ভয়ে গিয়ে বাবার কাছে দাঁড়ালো। বাবাকে বলামাত্রই বাবা ছাতি নিয়ে তেড়ে এলেন, স্কুলে যাচ্ছিলেন। ছাতির বাট দিয়েই মারা শুরু করলেন কেষ্টাকে। কেষ্টা মার খেতে খেতে শুয়ে পড়লো নীচে। একটা কথাও বললো না। একটা আহা উঁহুও করলো না। ফ্যাল ফ্যাল

করে বাবার দিকে তাকিয়ে রইলো। মার খেতে খেতে একসময় অজ্ঞান হয়ে গেলো।

এতক্ষণে কেষ্টার বাবার হুঁশ হ'লো। তাইতো ছেলেটাও যে মরে যাবে। তাছাড়া চাকলাদারের দেহটাও জঙ্গলে লুকিয়ে ফেলা দরকার।

স্কুলে আর যাওয়া হ'লো না তার। কানাপুকুরের পথ ধরলেন। বারবার এদিক ওদিক দেখলেন কেউ তাকে দেখছে কিনা। কেষ্টা যেখানটার কথা বলেছিলো সেখানটাতে গিয়ে দেখলেন চাপ-চাপ রক্ত আছে ঠিকই, তবে কোথায় চাকলাদারের দেহ! তবে কি শিয়ালে টেনে নিয়ে গেলো! আশেপাশে ভাল করে খুঁজে দেখলেন। না, কোথাও নেই। এখানে যা শিয়াল। হয়তো শিয়ালেই টেনে নিয়ে গেছে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরলেন কেষ্টার বাবা। অনেক খোঁজাখুজি করেছেন, কাজেই ফিরতে বিকেল হয়ে গিয়েছে। ফিরে দেখেন কেষ্টার তখনো জ্ঞান ফেরেনি। গায়ে ভীষণ তাপ। জ্ঞান ফিরতে ফিরতে হু'দিন লেগে গেল। কিন্তু জ্বর তখনো সারেনি, বরং আরো বেড়েছে।

এদিকে হুদিন চাকলাদারকে লোকে না দেখে, অনেক খোঁজা-খুঁজি করেও তাকে না পেয়ে ভাবলো—পাগলা বুঝি পালিয়েছে। আসল বাপারটা জানলো শুধু তুজন। কেষ্টা আর কেষ্টার বাবা। কেষ্টার জ্ঞান ফিরলো ঠিকই, তবে জ্বরের ঘোরে বিকার বকতে লাগলো। কখনো বলছে—পুলিশ, পুলিশ, পুলিশ এসেছে। না, ধরবেন না ; না, না। কখনো বলছে আর মেরো না।

* * * *

অনেকদিন ধরে চাকলাদারকে খুঁজে সবাই প্রায় হাল ছেড়ে দিল। চাকলাদার-প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গিয়েছিল প্রায়। চাকলাদাকে

সবাই যখন প্রায় ভুলতে বসেছে ঠিক তেমনি সময়ে—তেমনি একদিন বেরুলো খবরটা। যুগান্তর পত্রিকায় ঃ—

লালবাবার কীর্তি

লালবাবা গ্রেপ্তার। লালবাবার কীর্তি এতদিনে ধরা পড়লো। লালবাবা যে জাল সাধু তা জানা গেছে। তার বিরাট চুলের জটার মধ্যে লুকানো থাকতো খুব ছোট ট্রান্‌সমিটার যন্ত্র। রেডিও থেকে যেমন বিভিন্ন তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, লালবাবার মাথার এই ট্রান্‌সমিটার থেকে তেমনি কয়েকটি নির্দিষ্ট বিদ্যুৎতরঙ্গ অনবরত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো।

আমাদের সমস্তরকম চিন্তা, অনুভূতি মাথাতে বিদ্যুৎতরঙ্গের আকারে প্রকাশ পায়। চিন্তার বহিঃপ্রকাশও তাই হয়। এক একরকম অনুভূতি এক একরকম বিদ্যুৎতরঙ্গের অকারে প্রকাশ পায়। লালবাবার ফটোগুলোর ভিতরে থাকতো খুব ছোট ছোট গ্রাহকযন্ত্র, যাতে লালবাবার মাথার ট্রান্‌সমিটার যন্ত্র থেকে পাঠান বিদ্যুৎতরঙ্গ ধরা পড়তো। ফটোর মধ্যেই থাকতো—এই তরঙ্গ ফটোর সামনে থাকা মানুষের মাথায় পাঠাবার ব্যবস্থা। ফলে লালবাবার মাথার ট্রান্‌সমিটার প্রেরিত তরঙ্গ ফটোর সামনে থাকা মানুষের মাথায় প্রকাশ পেতো। কোন তরঙ্গে এমন অনুভূতির সৃষ্টি হ'তো যে মনে হ'তো লালবাবা সত্যিই অবতার। কোন তরঙ্গে মনে হ'তো লালবাবা সব বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। কোন তরঙ্গে মনে হ'তো লালবাবার ফটো থেকে বোধ হয় বিভূতি পড়ছে। আর ফটোগুলোর কাচে এমন এক রাসায়নিক মাখানো থাকতো যা এমনি দেখা যায় না অথচ একটু গরম হ'লে বিভূতির আকারে নীচে পড়ে। লালবাবার ফটোসমেত লকেটের গ্রাহকযন্ত্রে বা আঙটির গ্রাহকযন্ত্রে এমন তরঙ্গে ধরা পড়তো যাতে লকেটের বা আঙটির সামনে থাকা মানুষের মনে হ'তো সামনের মানুষটির ক্ষতি হ'তে দেওয়া উচিত নয়।

এ পদ্ধতিতে লালবাবা দিনের পর দিন ভক্ত সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছিলেন। তবে কারসাজি ধরে ফেলেছেন সুভাষ চাকলাদার নামে একজন গোয়েন্দা। বর্মাতে তিনি কাজ করতেন। রিটায়ার্ড হয়ে সম্প্রতি বারাসতে আছেন।

খবরটা পড়ে সবার চক্ষু তো চড়কগাছ! চাকলাদারের পেটে পেটে এতো! পরের দিনই চাকলাদারকে আবার বারাসতের বুকে দেখা গেল। চাকলাদারের মুখেই সকলে জানতে পারল :— নিজের ঘরে লালবাবার ফটো টাঙাতে গিয়ে যখন ফটোখানা ভেঙ্গে গেলো, ভাঙ্গা টুকরো কুড়োতে গিয়ে দুটো খুব ছোট ছোট যন্ত্র পাই। একটা দেখলাম গ্রাহকযন্ত্র, অন্যটা প্রেরকযন্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ হয়। সমীরবাবুর ঘরের লালবাবার ফটো ভেঙ্গেও একই জিনিষ পাই। তারপর নেশার মতো ঘরে ঘরে গিয়ে লালবারার ফটো ভেঙ্গে ফেলি এবং প্রতিক্ষেত্রেই এক জিনিষ পাই। ব্যস, সামান্য কাজই বাকি ছিল। নিজের পরিচয় দেখিয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে লাল-বাবার মাথা সার্চ করি ও প্রেরক যন্ত্র পাই।

এত কথা একসঙ্গে বলে চাকলাদার দম নিতে থাকেন। চারিদিকে চুপচাপ অখণ্ড নীরবতা। সেই শ্বাসরোধী নীরবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে মুন্না বলে উঠলো—'কাকু সত্যিই গ্রেট।' শীতলের কাকা অমনি যোগ দিল—'চাকলাদার দি গ্রেট।' অখণ্ড নীরবতা ভেঙ্গে পড়লো হো হো হাসির শব্দে।

হাসির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন চাকলাদার। গেলেন কেষ্টাদের ঘরে। কেষ্টার ঘরে যখন পেঁছুলেন তখন কেষ্টার বাবা ঘরে নেই। বাজারে গিয়েছেন। পথেই সব শুনে নিয়েছেন। কেষ্টার হাতে মার খাওয়ার কথা কাউকে বলেননি চাকলাদার। বলেছেন হঠাৎ পড়ে গিয়ে মাথায় চোট খেয়েছেন। মাথায় তাই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

চাকলাদার কেষ্টার জ্বরের কথা বারাসাত এসেই শুনেছেন। কেষ্টার বিছানার কাছে যখন বসলেন প্রথমটা কেমন চমকে উঠেছিলো

কেষ্টা। চীৎকার করে উঠেছিলো—আমাকে মারবেন না মারবেন না। সাতরাজ্যের ভয় তাকে যেন গ্রাস করতে চাইলো। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো, কেঁপে গেল গলা। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো শরীর।

চাকলাদার কিছু বললেন না। শুধু আস্তে কেষ্টার কপালে হাত বুলোতে লাগলেন। চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙ্গুল চালালেন। আরামে কেষ্টার চোখ বুজে আসতে চাইলো। সমস্ত উত্তেজনা মুহূর্তের মধ্যে যেন ঘাম দিয়ে ছেড়ে গেল। কেষ্টার চোখ গিয়ে পড়লো মায়ের ফটোতে। মায়ের কথা নতুন করে মনে পড়ল তার। ছোট্ট বয়সে যে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতেন। যে মা ঘুমুবার সময় মাথার চুলে আস্তে আস্তে আঙ্গুল বুলিয়ে দিতেন। যে মা ঘুমুবার সময় গান গাইতেন—খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ালো। কেষ্টার দু'চোখ আস্তে আস্তে বুজে এলো।

মোহমুক্তি

এক

শিয়ালদা স্টেশন থেকে বেরিয়ে কয়েক পা বাড়িয়েই সামনে ভীড় দেখে থেমে গেলাম। একটি ছোট ছেলের মাথার ওপর দিয়ে আর তার দুপাশের ভদ্রলোকের ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে ভীড়ের মধ্যে মাথা গলিয়েই চমকে উঠলাম আমি। চমকে উঠলাম পাগলটাকে দেখে! ওকে ঘিরেই জটলা।

আগের মতো কুঁজো হয়ে হাটছে না ও। একরাশ গোঁফদাড়ি মুখটাকে রহস্যময় করে তুলেছে। তবুও সেই গোঁফদাড়ির জঙ্গলের প্রান্তদেশে নাক, মুখ, চোখ দেখে সহজেই চেনা যায় ওকে।

পরণে বস্ত্রের নামগন্ধ নেই। অনর্গল বকবক করে চলেছে। কখনো বলছে দর্শনের কথা, কখনো-বা বিজ্ঞানের। কখনো বলছে—বার্গসঁ-এর দর্শন মশাই, একদম সহজ। প্রুস্ত বা জয়েস্ একদম সাধারণ মশাই, একদম সাধারণ। কখনো-বা বলছে, কোন জীন-এরই আসল আকার, আসল রঙ আমরা জানি না। আমাকে যেভাবে দেখছেন এটা আমার আসল রূপ নয়—এ হেঃ, হেঃ, হেঃ··· ।

শেষের কথাটায় আবার চমকে উঠলাম আমি। অন্যান্য পথচারীদের মতো 'পাগলের কথা' বলে এড়িয়ে যেতে পারলাম না, তবে কি ওটা ওর আসল রূপ নয়। ও কি পাগল নয়?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর প্রত্যেকটি আচরণ লক্ষ্য করলাম। নাঃ, পাগলই বটে। ওর কথার মধ্যে কোন দার্শনিক বা বিজ্ঞানী কোন ভুল, ত্রুটি, কোন অসঙ্গতি খুঁজে পাবে না ঠিক, তবে ওর অন্যসব কাজকর্ম একেবারেই অস্বাভাবিক, অসঙ্গতিপূর্ণ। সেখানে সে বদ্ধ পাগল।

প্রত্যেক পাগলেরই পাগল হবার একটা ইতিহাস থাকে। ওর পাগল হবার ইতিহাস কি? রাস্তায় কোনো পাগলকে দেখে সাধারণতঃ কেউ তার পাগল হবার ইতিহাস খুঁজে বার করার চেষ্টা করে না। কিন্তু এর পাগল হবার ইতিহাস বার করার ইচ্ছা আমাকে প্রবলভাবে পেয়ে বসলো। কারণ এ পাগলটাকে আমি ভালভাবেই চিনি, চিনতাম। অন্ততঃপক্ষে বারো বছরের চেনা। তাছাড়া দার্জিলিং-এ হাওয়া বদলের জন্য যাবার সময় ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে গিয়েছি। পুরোনো ঘটনাগুলো একের পর এক চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মন ছুটে চলে পেছনে। পেছনে ছোটে মন।

দুই

ওর নাম গ্যালিলিও। নামটার নিষ্ঠুর আয়রনি এখনও আমাকে বিষণ্ণ করে তোলে। একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে। যে ঝুঁকে পড়ে বিচিত্র একটি ভঙ্গীতে দুলে দুলে হাঁটে। দৃষ্টি যার অসহায় ভীত বুদ্ধিহীন একটি প্রাণীর মতো। মুখ দিয়ে অনবরত লালা ঝরে পড়ছে। চোখের দিকে যে সোজা চোখ তুলে তাকাতে পারে না। তার নাম গ্যালিলিও দেওয়া, আমার মনে হয়েছে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা।

এই আয়রনি সব সময়েই নবাগতদের হাসির খোরাক জুগিয়েছে। আর উচ্চহাসির শব্দে সচকিত গ্যালিলিও চেষ্টা করত ওর নিজস্ব রীতিতে কারণ অনুসন্ধানের। তারপরেই অবশ্য করুণ হয়ে উঠত ওর মুখ। মুখে ফুটে উঠতো অস্বাভাবিক রকমের এক অসহায় ভাব।

ব্যাপারটা আমার ভাল লাগত না কখনোই। আমাদের সহকর্মীরা অনেকেই দুঃখ পেতেন এ নিয়ে। তবু ওর গ্যালিলিও নামটা থেকেই গেল।

গ্যালিলিওর ইতিহাস অধিকাংশ ইতিহাসের মতো সঠিক কেউ জানে না। আমাদের এই শিক্ষায়তনের দু-চারজন পুরোনো কর্মীর

কাছে শোনা ভাঙ্গাচোরা ঘটনা জোড়া দিয়ে জেনেছি আমাদের শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর কাজপাগল যে বিদেশী ফাদার, তিনিই গ্যালিলিওকে নিয়ে আসেন।

বহুবছর আগে আমাদের পিছনের বস্তির নোংরা রাস্তায় একটি শিশুকে ঘিরে নানাবয়সের কিছু ছেলেমেয়ে জটলা করছিল। ফাদার কৌতুহলী হন। কেননা মনোবিজ্ঞানী ফাদার জানতেন যে শিশুদের মধ্যে নিষ্ঠুরতার নেশা আছে। তাদের আপাত-অর্থহীন খেলাগুলোর মধ্যে প্রচণ্ড অপরাধ প্রবণতা মাঝেমাঝেই দেখা দেয়।

সেজন্য রীতিমত শঙ্কিত হয়েই ভীড়ের মধ্যে উঁকি মেরেছিলেন ফাদার। কিছুটা অপরাধবোধ এবং কিছুটা বিদেশী মানুষের প্রতি দূরত্বজনিত ভয়ের জন্যই হয়ত ঘিরে থাকা ছেলেমেয়েরা সরে গিয়েছিল। গ্যালিলিওকে ফাদার সেই প্রথম দেখেন।

শুনেছি তিনি নাকি চমকে উঠেছিলেন, একটি শিশুর চোখে অত অসম্ভব ভয়ের চিহ্ন দেখে। গ্যালিলিওর মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল জ্বলন্ত কয়লার এক টুকরো। ঘিরে থাকা শিশুদের ভয়ে তখনও হাত থেকে ফেলতে পারেনি।

নার্সদের হাতে ছেলেটিকে সমর্পণ করার সময় ফাদার বলেছিলেন ওর প্রতি মায়ের মতো যত্ন নিতে। তা না হলে সারিয়ে তোলা শক্ত হতে পারে। শক্ত হয়নি। প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

সেদিনই প্রবল জ্বরে পড়েছিল গ্যালিলিও। জ্বর ছাড়ার পর থেকেই ওর ব্যবহারের কিছু কিছু অসঙ্গতি দেখা যেত। বয়স বাড়ার সঙ্গে এর অর্থ আরও পরিষ্কার হ'লো। বিশেষ করে ওর স্মৃতিশক্তি হ'লো অত্যন্ত দুর্বল।

সেরে ওঠার পরও কেউ ওর খোঁজ করতে আসল না। ও থেকেই গিয়েছিল আমাদের শিক্ষায়তনের একজন হয়ে। ও কাজ করতো ক্যান্টিনে। কয়েকজনের কথা কিছু কিছু বুঝতে পারত। কয়েকটা ইঙ্গিত, কিছু পরিচিত শব্দ, ধ্বনি, এই নিয়েই ওর জগৎ।

কাজে অসম্ভব ভুল হতো তার। বাসনপত্র প্রায়ই ভেঙ্গে ফেলত। কিন্তু কিছু বলা যেতো না। কেননা জোরে কিছু বললেই ও অসম্ভব ভয় পেতো। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠতো। ফ্যাকাসে মুখে দ্রুত ঘরের কোণে ছুটে চলে যেতো, যেন পারলে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যায়। অস্বাভাবিক রকমের এক আতঙ্ক ছায়া ফেলত ওর মুখে।

গ্যালিলিও আমাদের শিক্ষায়তনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। যখন মাঝে মাঝে প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে লাইব্রেরীর কোণে ওর নিজের জায়গাটুকুতে পড়ে থাকত, তখন ফাঁকা ফাঁকা লাগত আমাদের।

গ্যালিলিওর চিকিৎসার চেষ্টা বহুবার করা হয়েছিল। যখনই কোনো নতুন মনোবিজ্ঞানী যোগ দিয়েছেন আমাদের মধ্যে, তখনই প্রায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্যালিলিওকে সারানোর দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। চিকিৎসার নতুনত্বে গ্যালিলিও প্রথমে ওর নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রবল আপত্তি জানালেও পরে অবশ্য মেনে নিতো।

তারপরই মনোবিজ্ঞানের জগতে নতুন ঢেউ উঠল। বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেসব গবেষণার ঢেউ আমাদের এই সাবেকী শিক্ষায়তনেও এসে লাগল। মনোবিজ্ঞানের জগতে পদার্থ-বিদ্যা, শরীরবিদ্যা এবং ইলেকট্রনিক্সের অনুপ্রবেশ আমরাও লক্ষ্য করেছিলাম।

আমাদের একজন তরুণ বন্ধু ইলেকট্রো-নিউরো-ফিজিওলজি বা জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপরে বিদেশ থেকে কাজ করে ফিরে আসল। মানুষের ইতিহাসের যে অসামান্য সম্ভাবনাময় নতুন দিগন্ত খুলে যাচ্ছে তার পরিচয় নিয়ে।

আমাদের এই তরুণ বন্ধুটির নাম নির্মলেন্দু। ছ'বছর আমেরিকায় কাটালেও তার হাবভাবে বিদেশীর কোনো ছায়াই পড়েনি। তার কাছেই ভালভাবে শুনলাম সেই অসামান্য সম্ভাবনাময় নতুন দিগন্তের কথা।

মলিকিউলার বায়োলজিও সাইকো-সার্জারী যে বিপ্লব সূচনা

করেছিল তার খবর অবশ্য আমাদের অজানা ছিল না। আমাদের দেহের সমস্ত কাজকর্মই হচ্ছে কতকগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া। সমস্ত মনোবিকলনেরই যে শেষ পর্যন্ত জৈব ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে--- ফ্রয়েডের এই সন্দেহ আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছিল।

বিশেষতঃ সাইকো-সার্জারী সম্বন্ধে আমরা অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের আলোচনা পাভলভ, ফ্রয়েড, লাং থেকে ইলেকট্রনিক্‌সের দিগন্ত পর্যন্ত ছুঁই ছুঁই করত।

এইসময় বোধহয় এই নতুন ধারায় গ্যালিলিওর চিকিৎসার কথা কারোর মনে আসে। নির্মলেন্দু অবশ্য আপত্তি জানিয়েছিল। তবে তার আপত্তি আমাদের উৎসাহের তলায় তলিয়ে যেতে দেরী হ'লো না। ঠিক করলাম স্বপন, বিকাশ ও আমি এই পরীক্ষা চালাব। নির্মলেন্দু আমাদের গাইড করবে। এক অসাধারণ পরীক্ষার নেশায় আমরা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আর সুযোগও জুটে গেলো অদ্ভুতভাবে। এই পরীক্ষা চালাবার জন্য বিদেশ থেকে মোটা রকমের একটা সাহায্য পাওয়া গেলো। পরিকল্পনা রূপ নিতে দেরী হ'লো না।

আমাদের শিক্ষায়তনেরই কোণের দিকের বড় ঘরটা নানারকম যন্ত্রপাতিতে সাজিয়ে তুললাম পরীক্ষা চালাবার জন্য। গ্যালিলিও সম্পর্কে নির্মলেন্দুর কৌতুলের শেষ ছিল না। প্রায়ই পুরোনো কর্ম-চারীদের জিজ্ঞেস করত, গ্যালিলিওকে কোথায় কখন কি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

গ্যালিলিওর ওপর কারণে-অকারণে প্রায়ই চটে যেতো নির্মলেন্দু। বোধহয় এ ধরণের পরীক্ষায় ওর প্রবল আপত্তি ছিল বলে। আবার গ্যালিলিওকে সবচাইতে বেশী আদর করতো নির্মলেন্দুই। একদিন তো দেখি গ্যালিলিওকে প্রায় কোলে করে বিস্কুট খাওয়াচ্ছে নির্মলেন্দু। আমরা এ নিয়ে কত হাসিঠাট্টা করেছিলাম।

গ্যালিলিওকে ক্যান্টিন থেকে সরিয়ে আনা হ'লে ওই বড়

ঘরটাতে। প্রথম প্রথম অবশ্য আপত্তি করত গ্যালিলিও ওই ঘরে শুতে। বোধহয় অস্বস্তি বোধ করত। তারপরে এই বড় ঘরে একটা আলমারিতে বেশ কিছু বই এনে রাখার পর থেকে ও অবশ্য আর আপত্তি করত না শুতে। কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ মানিয়ে নিলো এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে।

ওর ভয় ভাঙ্গাতে মনোবিজ্ঞানের যাবতীয় অস্ত্র প্রায়োগ করতে হয়েছিল আমাদের। গ্যালিলিওকে বহুদিন ধরে পরীক্ষা করার পর এটুকু আমরা অনেকদিন আগেই বুঝেছিলাম যে শৈশবে কোনো প্রচণ্ড আঘাত বা অসুস্থতায় ওর মস্তিষ্কের সেন্‌সরি নিউরনগুলির একটা বড় অংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সেকেণ্ডারী নিউরনগুলো এই প্রাথমিক নিউরনগুলোর কাজ-চালাতে শুরু করে। মস্তিষ্কের যে অংশ রক্ত-সঞ্চালনের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে তার কোনো ক্ষতি হয়নি। যদিও লিম্বিক সিষ্টেম যার নিয়ন্ত্রণে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, যৌন অনুভূতি তার নিউরনগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং নিওকরটেক্স গড়ে তোলার সেকেণ্ডারী নিউরনগুলো এই কাজ চালাতে থাকে। ফলে ওর মস্তিষ্কের নিওকরটেক্স অংশ অগঠিত থেকে যায়। এই নিওকরটেক্সই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বুদ্ধি, স্মৃতি, চিন্তা, বিচার-শক্তি। সেই নিওকরটেক্স অগঠিত থাকায় ওর বুদ্ধি, স্মৃতি, চিন্তা ও বিচারশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ।

আমরা ঠিক করেছিলাম ESB বা যাকে বলা হয় ইলেক্‌ট্রিক্যাল স্টিমুলেশন অফ্ ব্রেন সেই পদ্ধতি ধরব। ব্রেনের বিভিন্ন অংশ বুদ্ধি স্মৃতি, চিন্তা, বিচারশক্তি ও বিভিন্ন অনুভূতি জন্য দায়ী। আবার এগুলি মাথার মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গের আকারে খেলে। ঠিক করলাম ব্রেনের এই বিভিন্ন অংশে কতকগুলো ইলেক্‌ট্রোড গেঁথে দিয়ে একটি বিশেষ ধরণের ওয়েভ জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠাব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে। প্রথমে ওর মস্তিষ্কের সেরিব্রাল করটেক্সের কিছু নিউরনকে বিচ্ছিন্ন করে নিওকরটেক্স গড়ে তুলবো, পরে বাইরের থেকে নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে নিউরনগুলোকে চার্জ করে হাই

এনার্জি লেভেলে রাখবো। এর ফলে বুদ্ধি, স্মৃতি, চিন্তা, বিচারশক্তি, বিভিন্ন অনুভূতি যারা মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আকারে খেলে তারা উচ্চশক্তি-সম্পন্ন হবে।

যদিও অপারেশনটা খুব বেশী যন্ত্রণাদায়ক ছিল না। তবু আমরা কোনো ঝুঁকি নিইনি। মাথা ন্যাড়া করে অজ্ঞান অবস্থায় ওর মাথায় ইলেকট্রোড বসান হ'লো। অবশেষে পূর্বপরিকল্পিতভাবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠান হ'লো ওর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে।

অপারেশন শেষ হতে বেশী সময় নিলো না। চোখ খুললে ওর চোখে একটা অসাধারণ উজ্জ্বলতা দেখতে পেলাম। এ উজ্জ্বলতা আমাদের পরীক্ষার সফলতার কথাই ঘোষণা করল।

সেদিনটা ও শুয়েই কাটাল। বিছানা ছাড়ার পর ও সব জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা শুরু করল। সব জিনিসকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখল, স্পর্শ করে দেখল, শুঁকে শুঁকে দেখল।

কয়েকদিনে মধ্যেই বোঝা গেল ওর বুদ্ধি ও স্মৃতি দুটোই অসাধারণ, প্রায় অতিমানবিক হয়ে উঠেছে। ওর শিক্ষার পাঠ নিতে গিয়ে আমরা অগাধ জলে পড়ে গেলাম। প্রাথমিক ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি অত্যন্ত অল্প সময়ে অসম্ভব ভালো শিখে ফেলতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে আমি কঠিন অসুখে পড়ি। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন বুকে দোষ হয়েছে। হাওয়া বদল করতে হবে, বাধ্য হয়ে বেশ কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে চলে গেলাম দার্জিলিং। তারপরে অবশ্য শরীর খুব খারাপ থাকায় গ্যালিলিও সম্পর্কে একেবারেই খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। কিন্তু সে তো এই কয়েক মাস আগের কথা! দিব্যি সুস্থ দেখে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে কি হয়ে গেলো এতো, যার ফলে ওর এই দশা!

তিন

হঠাৎ উচ্চহাসির শব্দে সচকিত হয়ে উঠলাম। পুরোনো

কথা ভাবতে ভাবতে খেয়ালই করিনি, পাগলটা কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

গ্যালিলিওকে আর কিছুক্ষণ খুটিয়ে দেখার পর রওনা দিলাম আমার ফ্লাটের দিকে। নাঃ ব্যাপারটা কি জানতেই হবে নির্মলেন্দুর কাছে। নির্মলেন্দু আর আমি একই ফ্লাটে থাকি। তিনতলার ডানদিকের অংশটা আমার, বাঁ দিকটা নির্মলেন্দুর! ঢোকার আগে নির্মলেন্দুর ঘরের দরজা দেখলাম খোলা। তাহলে নিশ্চয় ওকে ঘরে পাবো। গ্যালিলিও সম্পর্কে কৌতুহলটা আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। ওর ঘরে ঢুকে পড়লাম।

কিন্তু কই নির্মলেন্দু? ঘরে তো কেউ নেই। তাহলে নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও গিয়েছে। এখুনি এসে পড়বে; এই আশায় ওর চেয়ারটায় বসে পড়লাম। সামনের টেবিলে একগাদা বই রয়েছে। অধিকাংশই জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ওপর। সব এলোমেলো সাজানো। ছেলেটা একেবারেই অগোছালো।

সময় কাটাবার জন্য বইগুলো যত্ন করে একটার পর একটা সাজানো শুরু করলাম। হঠাৎ অনেকগুলো বইয়ের নীচে ওর ডাইরীটা নজরে পড়ল। নির্মলেন্দুর প্রতিদিন ডাইরী লেখার অভ্যাস রয়েছে। ডাইরী লিখতে ওর একদিনও ভুল হয় না।

হাজার কাজ থাক যতই রাত হোক ঘুমোবার আগে প্রতিদিন ডাইরী লেখা চাই-ই চাই। আমরা হাজার চেষ্টা করেও ওর এ অভ্যেসটা ভাঙ্গাতে পারিনি।

আরে! এটা দেখছি এবছরের ডাইরী। ভাবলাম এতে গ্যালিলিওর কথা কিছু থাকতে পারে। কেননা গেলো কয়েকমাসে ওর কাজকর্মের প্রায় সারাক্ষণ জুড়েই ছিলো গ্যালিলিও। আমি দার্জিলিং গিয়েছিলাম ৩রা জানুয়ারী। তারপরের তারিখ থেকে ডাইরীর পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে শুরু করলাম। প্রতিদিনই কিছু না কিছু লেখা আছে গ্যালিলিও সম্পর্কে। ২৫শে জানুয়ারীর পৃষ্ঠায় দৃষ্টিটা হঠাৎ আটকিয়ে গেলো। ওই পৃষ্ঠায় লেখা আছে—

"ভবুন যে শিশু একদিনে তিনটে ভাষায় বর্ণপরিচয় এবং যোগ বিয়োগ পর্যন্ত শিখে ফেলে তার মুখোমুখি হলে কি করবেন? ওর 'কোন'র জবাব দিতে গিয়ে আমাদের বিদ্যাভাণ্ডারের স্বল্পতা অত্যন্ত বেশীরকম প্রকট হয়ে উঠেছে……।"

২রা ফেব্রুয়ারীর পৃষ্ঠায় দেখলাম লেখা আছে—"গ্যালিলিওর আই-কিউ এত বেড়ে গিয়েছে যা কল্পনা করতে পারছি না। ওর চিন্তার স্বকীয়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। উপবৃত্ত ইত্যাদি আঁকার অদ্ভুত সব পদ্ধতি বার করে ফেলেছে ও। যখন দেখছি আমাদের চার ঘণ্টার পরিশ্রম ও কয়েক মিনিটে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেছে, তখন অসম্ভব আনন্দ পাচ্ছি এমন কথা জোর দিয়ে বলতে পারি না।" ডাইরীর পরের কয়েকটা পৃষ্ঠা গোগ্রাসে পড়ে ফেললাম—

"২৮শে ফেব্রুয়ারী। আস্তে আস্তে প্রশ্ন করা ও কমিয়ে দিচ্ছে। আমাদের স্থান নিয়েছে লাইব্রেরীর মোটা মোটা বইগুলো। কি পড়ছেনা ও। কীটসের দর্শন থেকে সামুদ্রিক উদ্ভিদের বিকাশ পর্যন্ত সবকিছু ওর বুভুক্ষু মস্তিষ্ক গ্রাস করে ফেলেছে। বার্গসঁ-এর দর্শন ওর কাছে অত্যন্ত সহজ। প্রুস্ত বা জয়েস ওর মতে একদম সাধারণ……।"

"৩রা মার্চ। আজ গ্যালিলিও হঠাৎ কথাচ্ছলে বলেছে—আনইউজুয়্যালি ষ্টিমুলেটেড ইগো না থাকলে কেউ কোনদিন মহাপুরুষ হতে পারে না! কথাটা কিন্তু ভেবে দেখার মতো…।"

"৬ই এপ্রিল। আস্তে আস্তে গ্যালিলও এবং আমাদের সম্পর্কটা পালটিয়ে যাচ্ছে, এখন কোন কিছু জানতে গ্যালিলিও আমাদের কাছে আসে না। আমরা যাই ওর কাছে। আমাদের প্রতি গ্যালিলিওর মনোভাবটা ক্রমে শিশুদের কাছে সহনশীল বৃদ্ধের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সঙ্গে ওর দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়ছে……।"

"১৫ই এপ্রিল। গ্যালিলিও যদিও আমাদেরই সৃষ্টি তবুও কেন জানিনা খুব ভাল লাগছে না ওর এই প্রজ্ঞার ভাবটাকে। খুলে ও

বলে না কিছুই। কিন্তু ওর বসার গর্বিত ভঙ্গি, গলার স্বর, চোখের ভাব সমস্ত কিছুতেই ধরা পড়ছে ওর সুপিরিয়রিটি ভাবটা। মনে হচ্ছে ও এতটুর ভালো না হলেই ভালো হতো······!"

"২৬শে এপ্রিল গ্যালিলিও মনোবিকাশ ও মনোবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছে। এবার কি আমাদের ওপরই পরীক্ষা চালাবে ও? নাঃ আর সহ্য করা যাচ্ছে না ওকে!"

"২৭শে এপ্রিল। ওর কথাবার্তা এখন আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। ওকি পাগল হয়ে গেলো! আইনস্টাইনকে পর্যন্ত বোকা বলছে। বলছে—ও কতটুকু জানতো? ও শুধু মাস, টাইম আর ভেলসিটিকেই আপেক্ষিক বলে গিয়েছে। আসলে সবই আপেক্ষিক। কোনো বস্তুর আসল স্বরূপ যে কি আমরা কেউই তা জানি না। আইনস্টাইনের থিওরী অফ রিলেটিভিটি অনুসারে বস্তুর আকার ও ভর আপেক্ষিক। কোনো বস্তুর আসল রঙও আমরা জানিনা, কেননা এমন অনেক রঙ আছে যা আমরা কেউই দেখতে পারিনা। আবার কোনো বস্তুকে আমরা যে আকারে, যে রঙ-এর দেখি অন্য কোন প্রাণী সেই বস্তুকে সেই আকারে, সেই রঙে নাও দেখতে পারে।"

আমাদের মধ্যে ভুলে গিয়ে ও আজ আবেগের বশে অনেক কথা বলে ফেলেছে। পরে অবশ্য আমাদের দূরত্বটা বুঝতে পেরে ওকে দেখলাম এক অদ্ভুত একাকীত্ব ছেয়ে ফেলেছে······।

"২৮শে এপ্রিল। আজ একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। গ্যালিলিওর ঘরে দেখি টেস্টটিউব ইত্যাদি নিয়ে ও কিসব করছে। কি করছে জিজ্ঞাসা করাতে ও বলল—'নাঃ তোমাদের মতো বোকাদের সঙ্গে আমি আর থাকতে পারছি না। ক্লোনিং-এর সাহায্যে আমার মতো শতাধিক গ্যালিলিও তৈরী করব। ল্যাবরেটরীতে আমার শুক্রাণু অন্য কোন নারীর ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিয়ে তা থেকে 'শ' 'শ' গ্যালিলিও বানাব। তোমাদের আর দরকার হবে না।

মুখে কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু ভিতরের রাগও আর চেপে রাখা সম্ভব নয়।"

"৪ঠা মে। কাল গ্যালিলিওর মস্তিষ্কের আর একটা অপারেশন করব। মানুষের মস্তিষ্ক সবচাইতে কত বেশী উন্নত হতে পারে এটা হবে তারই পরীক্ষা। গ্যালিলিও রাজী হচ্ছিলো না। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করিয়েছি ওকে।"

এক নিঃশ্বাসে পরের পৃষ্ঠাটা উল্‌টিয়ে ফেললাম পরীক্ষার কথা জানার জন্য। কিন্তু একি! ৫ই মের পৃষ্ঠায় দেখছি কিছুই লেখা নেই! কেমন ময়লা। ৫ই মের পর থেকে দেখলাম আবার যথারীতি ডাইরী লেখা আছে। ও পৃষ্ঠাগুলোতে গ্যালিলিওর কোনো উল্লেখ পেলাম না।

চার

কখন এলি? কেমন আছিস? দার্জিলিং-এর হাওয়া কেমন লাগলো? আমার উদ্দেশ্যে একগাদা প্রশ্ন ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঘরে ঢুকে পড়ল নির্মলেন্দু।

তারপরেই আমার হাতের দিকে নজর যেতে আর আমার হাতে ওর ডাইরীখানা দেখে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো ডাইরীখানা।

—কিরে অন্যের ডাইরী পড়ছিলি কেন? চেঁচিয়ে ওঠে নির্মলেন্দু। ইয়ার্কি করছে ভেবে বললাম—একশোবার পড়ব।

আমার কথাটা আগুনে ঘি পড়ার মতো হলো।

—পড়তে লজ্জা লাগলো না? রাগে যেন ফেটে পড়ে নির্মলেন্দুর গলা। শেষের কথাটা আমার মুখের উপর যেন শপাং শব্দ তুলে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল।

এবারে কথার ওয়েট বুঝতে পারি। ওর এই হঠাৎ রাগ দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গেলাম। তারপরেই সামলিয়ে উঠি। কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে উঠল উত্তর দিতে গিয়ে।

বললাম—খুব অন্যায় কিছু করেছি কি? আগে তো তুই-ই তোর ডাইরী পড়ে শোনাতিস।

—তাহলে এখনো শোনাব একথা কি করে ভাবলি? মনের কোথায় যেন কথাগুলো গিয়ে আঘাত করল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলি—ওঃ, তাতো বুঝিনি। পড়ার ইচ্ছেও ছিল না। অবশ্য আসার সময় গ্যালিলিওকে শিয়ালদায় পাগল অবস্থায় দেখলাম। অসুস্থ থাকায় ওর কোন খোঁজখবর পাইনি। তোর কাছে এসেছিলাম। তোকে না পেয়ে ডাইরীখানায় কিছু খবর পাব আশা করে পড়েছিলাম।

কদ্দুর পড়েছিস? কদ্দুর পড়েছিস? অকারণ ব্যস্ত হয়ে উঠল নির্মলেন্দু।

নির্মলেন্দুর আচরণে কেমন অস্বস্তিবোধ করছিলাম। একটু কর্কশ ভাবে জবাব দিলাম—৪ঠা মে পর্যন্ত।

৫ই মে গ্যালিলিওর ওপরে আর একটা অপারেশনের কথা ছিল। তার কথা কিছু লেখা নেই দেখলাম তোর ডাইরীতে।

ওঃ লেখা নেই! তা বলবি তো, শেষ অপারেশনটার কথা জানতে চাস। সেদিন ক্লান্ত থাকায় লিখিনি।

ডাইরীটা বালিশের তলায় রাখতে রাখতে যেন নরম আর স্বাভাবিক হয়ে আসে নির্মলেন্দুর গলা।

কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল—'শেষ অপারেশনটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলরে। পাগল হয়ে গেলো গ্যালিলিও। ঠিক করেছিলাম আগের অপারেশনের মতো এ অপারেশনের সময় নিউরনগুলোকে আরও চার্জ করে ওদের আরও হাই-এনার্জি লেভেলে রেখে গ্যালিলিওকে আরও অনেক বেশী বুদ্ধিমান ও স্মৃতিধর করে তুলব। কিন্তু কি হ'ল জানিস—। এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে যায় নির্মলেন্দু। বোধহয় অতীতের গর্ভ থেকে পরের ঘটনাকে বার করে আনার চেষ্টা করে।

গ্যালিলিও সম্পর্কে যে ইন্‌টারেস্টটা ফেরার পথে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল, কিছুক্ষণ আগের তিক্ত ব্যাপারটায় কখন

সেটা চাপা পড়ে গেছে খেয়ালই করিনি। কথার মাঝখানে নির্মলেন্দুর হঠাৎ এই থমকে দাঁড়ানো আবার সেই ইন্টারেস্‌কেই জাগিয়ে তুলল। সে ইনটারেস্‌টা এমনি তীব্র হয়ে উঠল যার এক ঝট্‌কায় মনের সমস্ত রাগ কোথায় ছুটে পালাল। কিছুক্ষণ আগের ক্ষুব্ধতা চাপা পড়ে গেলো। রাগ আর ক্ষুব্ধতার সেই সমাধি থেকে একটিমাত্র প্রশ্ন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল—কি হ'লো? কি হ'লো তারপর?

নির্মলেন্দু যেন অতীতের কোন তলে তলিয়ে গিয়েছিল। আমার কথায় আবার সম্বিত ফিরে পায়।

—হ্যাঁ। তারপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠাবার সময় ভুলে বেশী বিদ্যুৎ পাঠানো হ'লো। অত মারাত্মক শক সইতে পারবে কেন মস্তিষ্ক? পাগল হয়ে গেল গ্যালিলিওটা।

অনেকক্ষণ ধরে আফশোষ করল নির্মলেন্দু। বলল আর একজন মানুষ খুঁজছি যার উপরে এই অপারেশন করে জগৎশুদ্ধ সবাইকে অবাক করে দেব। কিন্তু কাউকেই খুঁজে পাচ্ছি না। যদি শেষে গ্যালিলওর মতো পাগল হয়ে যায় সবার এই ভয়।

আর কিছুক্ষণ নির্মলেন্দুর সঙ্গে কথা বলে ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

পাঁচ

পরের দিন ভোরবেলা। নির্মলেন্দুর ঘর আর আমার ঘরের মাঝখানে একটা বারন্দার মতো আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছি। দেখলাম নির্মলেন্দুর ঘরের দরজা খোলা। দরজা ভিতর থেকে দেওয়ার অভ্যেস ওর একদম নেই। কি একটা জিজ্ঞাসা করব ভেবে দাঁত মাজতে মাজতেই ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

বুকের অসুখ পুরোপুরি সেরে গিয়েছে আমার। ডাক্তার তবুও আরও কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েক মাস ছুটিতে থাকায় আর ভাল লাগছিল না আমার। ডাক্তারের শেষ অনুরোধটা তাই রাখতে পারিনি। সোজা চলে এসেছি কলকাতায়। আজ

বেশ কয়েকমাস পরে জয়েন করব শিক্ষায়তনে। পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে হবে আবার দেখা মনটা তাই আজ খুশি খুশি।

নির্মলেন্দু বোধহয় বাথরুমে গিয়েছিল। বাথরুম বন্ধ। ভেতর থেকে জল পড়ার শব্দ আসছে। ওর বরাবর ভোরে উঠেই স্নান করার অভ্যেস। কি শীত, কি গ্রীষ্ম। আমার বন্ধুদের মধ্যে ও একজন শ্রেষ্ঠ বন্ধু। পাঠ্যাবস্থায় বহু বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি। একই হোষ্টেলে, একই রুমে। ওর বাবা সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বড়লোকের একমাত্র ছেলে নির্মলেন্দু।

বিদেশ যাবার আগেই নির্মলেন্দুর বাবা মারা যান। নির্মলেন্দু ছোট বয়সে মাকে হারায়। মাকে ভাল মনে পড়ে না তাই। মারা যাবার সময় বাবা সব সম্পত্তি নির্মলেন্দুর নামে উইল করে দিয়ে যায়।

এসব কথা নির্মলেন্দুর কাছেই শোনা। ওর প্রায় সব কথা আমাকে বলতো। এমন কি প্রতিদিন ডাইরী লিখে তাও পড়ে শোনাতো আমাকে। কিন্তু গতকাল কি হয়েছিল ওর কে জানে। ডাইরীটা প্রায় জোর করেই ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো। আর আগে এই ডাইরী পড়াবার জন্যই কত সাধ্য-সাধনা করত আমাকে। ওর এই ডাইরী শোনার জন্য কোনদিন আমার ভাগ্যে জুটত একটা সিগারেট, কোনদিন একটা চকোলেট। আর ভাগ্য ভাল থাকলে আরও বেশী জুটত। আমাকে কি তাহ'লে এখন আর বিশ্বাস করে না? তাছাড়া যতদূর পড়ছি তাতেতো গোপন করার মতো কোন কথা পেলাম না।

সকালবেলায় এসব কথা মনে হওয়ায় হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আরও কিছুক্ষণ পরে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকলাম। নির্মলেন্দু তখনও বাথরুমে।

ছয়

সেদিনই সকাল সাড়ে ন'টা। সবেমাত্র স্নান-খাওয়া শেষ করে শিক্ষায়তনে যাবার জন্য পোষাক পরা শুরু করেছি। নির্মলেন্দুর ঘর থেকে জোর কথা কাটাকাটির আওয়াজ পেলাম—

—কোথায় রেখেছিস বল ?

—আমি রাখি নাই বাবু।

—ফের মিথ্যে কথা, তুই সব জানিস।

—বিশ্বাস করেন বাবু, আমি কিছুই জানি না।

কিছুক্ষণ মন দিয়ে শোনার পর বুঝলাম রাগে চড়া গলাটা নির্মলেন্দুর। আর কাঁদো কাঁদো গলাটা আমাদের ঝাড়ুদার ঝুড়নের। ও ঝাড়ু দেয়, আমাদের ফাইফরমাস খাটে, আমাদের তদারকি করে। আবার আমাদের অবসর সময়ে গল্প করার লোকও ওই ঝুড়ন। বলতে গেলে ও আমাদের কর্তা ও কর্ম দুই-ই। ওর ওপরে রাগলো কেন নির্মলেন্দু ? ওর মেজাজটা দেখছি একদম তিরিক্ষে হয়ে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি পোষাক পরা শেষ করে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। আমাকে দেখেই ঝুড়ন লম্বা হয়ে আমার পায়ের উপর পড়ল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—বাবু, আপনি তো আমারে ভালোভাবেই জানেন। কোনদিন কাউর এক পয়সা খাই নাই। আর উনি আমারে চোর বলতে আছেন। কিছুক্ষণ আগে উনি আমারে এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দিছিলেন। সিগারেট কিনইয়া ফিরইয়া দেখি উনি বাথরুমে আছেন।

—আর ফেরত পয়সা বালিশের তলায় রাখার নাম করে বালিশের তলা থেকে ডাইরীটা সরিয়েছিস। বল কোথায় রেখেছিস ডাইরী ? —ওর কথায় বাধা দিয়ে নির্মলেন্দু গর্জে ওঠে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা আঁচ করতে পারি। ঝুড়নকে বললাম—

কিরে, বালিশের তলায় পয়সা রাখতে গেলি কেন ?

—উনি তো দরজা খুলইয়া রাখেন। তাই টেবিলে রাখতে সাহস পাই নাই।

ডাইরীতে টাকা-ফাকা ছিল নাকি ? —নির্মলেন্দুকে উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে দিলাম কথাগুলো।

—না, না।

—তবে তোর ডাইরী নিয়ে ওর কি লাভ ? ভাল করে খুঁজে দেখ কোথায় রেখেছিস।

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হ'ল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তোষকের তলা থেকে ডাইরীখানা বেরুলো। নির্মলেন্দু খুসী মনে কিছুটা অবাকভাব মিশিয়ে বলে—কিন্তু এটা এখানে আসলো কি করে ? কালতো বালিশের তলাতেই রেখেছিলাম।

—তোষকের তলাতেই রেখেছিলি। তোর যা ভুলো মন, চল্ চল্ ইন্‌সটিটিউট যাওয়া যাক। দেরী হয়ে গেলো অনেক।

প্রায় টানতে টানতেই নির্মলেন্দুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

সাত

শিক্ষায়তনে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় হ'লো। স্বপন, বিকাশের সঙ্গেও দেখা হ'লো।

বিকাশ আফশোষ করে বলল—একটু ভুলের জন্য গ্যালিলিওটা পাগল হয়ে গেলো।

বললাম—এই সিরিয়াস অপারেশনে এই সাধারণ ভুলটা তুই কি করে করলি ? কেউ বিদ্যুতের অত প্রচণ্ড ঢেউ সহ্য করতে পারে ?

'আমি', 'আমি-ই……' বলে আমতা আমতা করতে থাকে বিকাশ। পুরো কথাটা আর বলা হয় না ওর। বোধহয় নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত ও।

তারপরে গেলাম স্বপনের ঘরে। ও একা বসেছিল। আমাকে

দেখেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিল। ওর কাছে কিছু মজার খবর নেবার পর নিজের কাজ শুরু করলাম।

আট

বিকালে ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি নির্মলেন্দু আমার আগেই ফিরেছে। বলল খিদে পেয়েছে। ঝুড়নকে ডেকে কিছু খাবার আনতে দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। তাড়াতাড়ি পোষাক ছেড়ে বাথরুমে ঢুকলাম স্নান সারার জন্যে। উঃ, যা গরম পড়েছে আজ।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখি নির্মলেন্দু আমার টেবিলে কি যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। আমাকে দেখেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল— তোর সিগারেটের প্যাকেটটা দেতো। একটা খাই। আমার সিগারেট সব ফুরিয়ে গিয়েছে। বলেই ধপ করে বসে পড়ল আমার বিছানার উপর।

সিগারেটের প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। তারপর আমার পোর্টফোলিওটা খুলতে খুলতে বললাম—তুই কি সিগারেট খুঁজছিলি? না, এই কাগজটা খুঁজছিলি? বলেই ব্যাগ থেকে ওর ডাইরীর ৫ই মের সাদা ময়লা কাগজটা বার করলাম।

'কই দেখি দেখি', বলে—আমার হাত থেকে ওটা প্রায় ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে নির্মলেন্দু। কিন্তু ব্যর্থকাম হয়ে আবার বসে পড়ল বিছানায়। —কাল তুই যখন আমার হাত থেকে ডাইরীটা ছিনিয়ে নিলি তখনই কেমন কেমন লেগেছিল। আরও কেমন কেমন লেগেছিল যখন দেখলাম তোর ডাইরীতে বিশেষ দিন ৫ই মের পৃষ্ঠায় কিছু লেখা নেই। যে কোনদিন ডাইরী লিখতে ভোলে না, সে ঐ বিশেষ দিনটাতে কিছু লিখল না কেন? এমন কি ৫ই মের পরে গ্যালিলিও সম্পর্কে কিছু লেখা নেই কেন?

সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হ'লো আজ সকালে দাঁত মাজতে মাজতে তোর টেবিলে ভ্যানিশিং লোশনের একটা শিশি দেখে

মনে হ'লো ভ্যানিশিং লোশন দিয়ে তুই কি করতে পারিস? এমন তো কোনদিন ব্যবহার করতিস না।

—আমার একটা দরকারী কাগজে হঠাৎ কালি পড়ে যাওয়ায় ওটা তোলার জন্যে ঐ ভ্যানিশিং লোশন কিনেছিলাম— আমাকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে নির্মলেন্দু। বোধহয় মুখোশটাকে শেষবারের মতো ধরে রাখার চেষ্টা করে।

তার কথায় বাধা দিয়ে আমি বলে উঠি—ধীরে বন্ধু, ধীরে। ইনস্টিটিউট গিয়ে গ্যালিলিওর পাগল হওয়ার জন্য বিকাশকে দায়ী করায় ও আমতা আমতা করে কিছু বলতে চেয়েছিলো। কিন্তু তুই ওর রিসার্চ গাইড বলে তোর নামে কিছু বলতে সাহস পায়নি। তুই-ই যে বেশী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়েছিলি গ্যালিলিওর মাথায়—এ কথাটা একান্ত গোপণীয়ভাবে আজ বলেছে স্বপন।

—না- না, না। আমি, আমি বেশী বিদ্যুৎ পাঠাইনি। আমি বেশী বিদ্যুৎ পাঠাতে যাব কেন? আর যদি পাঠিয়েই থাকি, তাহলে হয়েছে কি? মানুষের ভুলও তো হতে পারে।

ব্যাগ থেকে একটা বড় ফটো বার করতে করতে বলে উঠি—না ভুল হয়নি। ইচ্ছে করেই তুই বেশী বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়েছিলি গ্যালিলিওকে মেরে ফেলার জন্য। তার প্রমাণ এই ফটো। এটা তোর ডাইরীর ৫ইমের পৃষ্ঠার ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফ। ৫ই মে তুই অভ্যেসমতো ডাইরী লিখেছিলি ঠিকই। কিন্তু পরে ভয় হওয়ায় ও লেখা তুই এই ভ্যানিশিং লোশন দিয়ে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু লিখবার সময় কিছুটা কালি কাগজের ভেতরে ঢোকায় তোর লেখা কাগজের ভিতর ঠিকই লেখা ছিলো। ইনফ্রারেড রশ্মির কাগজের ভেতরে ঢোকার ক্ষমতা থাকায় ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফে এই লেখা ধরা পড়েছে।

—আমি লিখিনি ওটা। এসব মিথ্যে, মিথ্যে·····। কি আছে ফটোতে লেখা? ফ্যাকাশে মুখে ফটোর দিকে ঝুঁকে পড়ে নির্মলেন্দু।

ন্যাকামো করতে হবে না। কি লেখা তাতো ভালোভাবেই জানিস—বলে ফটোর লেখা পড়া শুরু করি—

"৫ই মে। অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়েছে। বছর বারো আগের কথা। সেটা ১৯৭১ সাল। পূর্ববঙ্গ মুক্তি-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে চলছিল বাঙ্গালীর উপর পাকিস্তানীদের নির্যাতন। এদেশেও তখন বিপ্লব চলছিল। সে সংগ্রাম মানুষে মানুষে অসাম্যের বিরুদ্ধে। কিছু কিছু সমাজ-বিরোধী এই সুযোগে দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। আমার কাকা পূর্ববঙ্গে থাকতেন। কাকীমা বহুদিন আগে গত হয়েছেন।

কাকাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। পাকিস্তানীদের অত্যাচারে ও প্রাণের ভয়ে সর্বস্ব খুইয়ে তিনি তার তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে আসলেন। কিছুদিন শরণার্থী শিবিরে থাকার পর এসে উঠলেন আমাদের বাড়ীতে। এদেশের পুলিশদের নাকি নির্দেশ দেওয়া ছিল বিপ্লবীদের দেখামাত্রই গুলি করার। তাই পুলিশ আর বিপ্লবীদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হ'তো একদিন এমনি একটা সংঘর্ষের পর দেখা গেল কাকা রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে আছেন।

কেউ কেউ বলল—কাকা এদেশে এসে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলল,—না, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন উনি। গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পুলিশের গুলি ওনার গায়ে লেগেছে, না বিপ্লবীদের—সে কথা কেউ বলতে পারল না।

মরার সময় 'গ্যালিলিও' 'গ্যালিলিও' বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন নাকি। গ্যালিলিও ওনার একমাত্র ছেলে। মাত্র তিন বছরের।

কাকা মারা যাবার পর বাবা খুব ভেঙ্গে পড়লেন। কয়েক মাস পরে তিনিও মারা গেলেন। মারা যাবার সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড করে গেলেন। গ্যালিলিওকে তার সম্পূর্ণ সম্পত্তি দিয়ে

গেলেন। আমার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো গ্যালিলিওর ওপর। একদিন রাত্রিবেলা ওকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসলাম। প্রতিবেশীদের বললাম মিথ্যেকথা।

ওখান থেকেই বোধহয় ফাদার ওকে সংগ্রহ করে এই শিক্ষায়তনে নিয়ে আসেন্। ভাগ্যের এমনি খেলা, আমিও চাকরী নিয়ে এলাম এই শিক্ষায়তনে।

অপারেশনের পর যখন ওর বুদ্ধি অত্যন্ত অসাধারণ হয়ে উঠলো তখন আর সহ্য করতে পারলাম না। প্রায়ই ভয় হ'তো এই বুঝি ওর ভোগ করা সম্পত্তি ও কেড়ে নেবে। তাছাড়া ওর অতো মেধাও সহ্য হতো না। সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌছেছিলাম আমি। তাই আজ ওর মাথায় অপারেশনের নামে বেশী বিদ্যুৎ পাঠিয়ে ওকে হত্যা করার চেষ্টা করি। কিন্তু পারলাম না। তবে আশার কথা, ও বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছে।"

ফটোগ্রাফের লেখা পড়া শেষ করে তাকালাম নির্মলেন্দুর দিকে। দেখলাম থরথর করে কাঁপছে ওর সারা শরীর। বললাম— আজ সকালে দাঁত মাজার সময় তোর ঘরে ঢুকে হঠাৎ ডাইরীর কথা মনে হয়েছিল। ডাইরীটা তোর বালিশের তলা থেকে বার করে ভাল করে পড়ে কোন জায়গায় কিছু না দেখতে পেয়ে আর ভ্যানিশিং লোশন দেখে ৫ই মের সাদা কাগজটাই ছিঁড়ে নিই। তারপর তাড়াতাড়ির জন্য ভুল করে ডাইরীটা তোষকের তলায় রেখেছিলাম। এরই ফলে ঝুড়ন প্রায় মার খেতে বসেছিল।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে চুপ করি আমি। বোধহয় দম নেবার চেষ্টা করি। হয়তো নির্মলেন্দুর মুখে কোন কথা আশা করি।

নির্মলেন্দু কিন্তু চুপ। কিছুক্ষণ আগের শরীরের সে কম্পন থেমে গিয়েছে। স্থির হয়ে বসে। বোধ হয় অপরাধ ধরা পড়ে যাবার আকস্মিকতায় পাথর হয়ে গিয়েছে ও।

কয়েকটা মুহূর্তের জন্য পৃথিবীর সমস্ত গতি, সমস্ত অনুভূতি,

স্তব্ধ হয়ে গেলো নির্মলেন্দুর কাছে। চোখের সামনে একটা কালো বিন্দু যেন ক্রমশঃ বড় থেকে আরও বড় হয়ে ঢেকে ফেললো। সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। দমকা হাওয়ায় প্রদীপের সলতের প্রান্তে ক্ষীণতম আলোর মত নির্মলেন্দুর অস্তিত্বও যেন ক্রমে নিভে আসল।

কিছুক্ষণ পর তার সেই বাক্যহারা নীরবতা শ্বাসরোধী গভীরতায় গভীর হয়ে উঠল। হাঁপিয়ে উঠলাম আমি। সেই নীরবতাকেই চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেবার জন্মে বোধহয় বলে উঠি—একি করলি তুই!

আমার কথায় চেতনার শিখাটি আস্তে আস্তে জ্বলে উঠল চেতনায় ফিরে এল নির্মলেন্দু। কিছুক্ষণ আগের সমস্ত স্তব্ধতা, সমস্ত নীরবতা এবারে ভাঙ্গে তার কান্নার ভেতরে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল—গ্যালিলিওকে একদম সহ্য করতে পারছিলাম নারে। এছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না।

স্বপন, বিকাশও ওকে সহ্য করতে পারতো না একদম।

—তাই বলে তুই ভাইকে এভাবে………। ছিঃ. ছিঃ, তোর গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করা উচিত।

নয়

আত্মহত্যাই করেছিল নির্মলেন্দু। গলায় দড়ি দিয়ে নয়। পটাশিয়াম-সায়ানাইড খেয়ে। পরের দিন সকালবেলা আমিই প্রথম আবিষ্কার করি ওর মৃতদেহ। তখনও গতকালের সেই প্যান্ট-সার্ট পরা, চেয়ারে বসা। মাথাটা টেবিলের ওপর কাত করা। বেশী রাতে পড়তে পড়তে টেবিলের ওপরে মাথা রেখে ও যেমনি করে ঘুমিয়ে পড়ত, যেন তেমনিই ঘুমিয়ে। টেবিলে ও একটি কাগজে লিখে রেখে গিয়েছে—

"আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। অনেকদিন ধরেই প্রায়শ্চিত্ত করব ভাবছিলাম। বুকের মধ্যে ছিল অসহ্য যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণা কাউকে বোঝাবার নয়। আমি পাপী, জানি না মরেও প্রায়শ্চিত্ত হবে কিনা।" চিঠি পড়তে পড়তে খেয়াল করিনি কখন চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে। খেয়াল করিনি কখন এক ফোঁটা জল চিঠির ওপর গিয়ে পড়েছে। কিছুদূর গড়িয়ে, কিছুটা জায়গা ছাপিয়ে বোধহয় 'প্রায়শ্চিত্ত' কথাটকে মুছে ফেলার প্রয়াসে অনেকটা আবছা করে তুলল।

ফাল্গুনের শেষ। সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। এমন সময় ডুয়ার্সের কাছাকাছি এক ডাকবাংলোতে দুজন রহস্যসন্ধানী বিজ্ঞানী আলোচনায় মেতে উঠেছেন। দুজনেই কলকাতার বাসিন্দে। দুজনের মধ্যে যার বয়স বেশী অর্থাৎ যিনি কাঁচা-পাকা চুলে, চোখে চশমা পরা, তিনি প্রফেসার সুজিত রায়। একটু অভিনেতার মতো কথাবার্তা বলায় অভ্যস্ত। প্রফেসার রায় হিসাবে পরিচিত। তার সঙ্গের ঘনিষ্ঠ মানুষ তারই সহযোগী কমল। তারা একটি জটিল রহস্যের সন্ধানেই এতদূর ছুটে এসেছেন। আসলে প্রফেসার রায়েরই এক প্রাক্তন ছাত্র মাধব সেন কলকাতা থেকে বহুদিন আগে এখানে এসে ব্যবসায় পসার সাজিয়েছে। সেই হঠাৎ একটা বিস্ময়কর তথ্য জানতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার রায়কে চিঠি দেয়। সে লিখেছিল, 'স্যার একটা বিশেষ কারণে আমি এই চিঠি লিখছি। এখানে একটা ন'ফুট লম্বা অতিমানবের সন্ধান পেয়েছি। জঙ্গলের ভেতরে যারা শিকার করতে কিংবা কাঠ কুড়োতে যায়, তারাই এই দৈত্যের তথ্য আবিষ্কার করেছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি এখানে কিছুদিন ছুটি নিয়ে এসে অনুসন্ধান চালালে সম্ভবত নতুন কিছু আলোকপাত করতে পারেন। গবেষণার ক্ষেত্রেও কিছু সুবিধা হতে পারে। আমি আপনার জন্য ডাকবাংলোর ব্যবস্থা করে রাখব। কোনো অসুবিধা হবে না। তবে ঠিক কোন তারিখে আসবেন, একটা চিঠি দিয়ে জানাবেন অবশ্যই। আপনার একান্ত অনুগত মাধব সেন।' মাধবের চিঠি পাবার পরই বায়োম্যাথামেটিকসের গবেষক প্রফেসার রায় তার অনুচরের খোঁজ করতে লাগলেন। অনুচর মানে কমল বিশ্বাস। স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভারসিটির গণ্ডিগুলো অনায়াসে

পার হয়েছে। সেও বায়োম্যাথামেটিক্সের রিসার্চ স্কলার। প্রফেসারের কাছে সে এখন আত্মীয়ের মতো। বিভিন্ন ব্যাপারেই প্রফেসার তাকে ডেকে পাঠান। প্রফেসারের স্ত্রীও কমলকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কমল চিঠিটা দেখে ছোট্ট প্রশ্ন করেছিল--কবে যাবেন স্যার। প্রফেসার হাসিমুখেই উত্তর দিয়েছিলেন– কয়েক দিনের ছুটির দরখাস্ত করেই আর ছুটির অনুমতি পেলেই যাত্রা শুরু করব বুঝলে।

* * * *

তারপরেই এই ডাকবাংলোয় আজ দুজনে দুপুর নাগাদ এসে উঠেছেন। মাধবের জন্য তারা অপেক্ষা করছেন। ডাকবাংলোর দারোয়ান চা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—হুজুর, মাধববাবু শাম্‌কো আয়েগা। হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই সন্ধ্যা করে এল মাধব। এরপর তিনজনই আলোচনায় মেতে উঠলেন।

চোখের পুরু লেন্সের চশমার কাঁচ ঘসে নিয়ে প্রফেসার বলতে শুরু করলেন—আসলে কি জান মাধব, বহুদিন থেকেই আমার একটা নতুন তথ্য আবিষ্কার করার ইচ্ছে আছে।

সাবজেক্‌টা খুবই ইন্টারেষ্টিং। আর আমার এই বিষয়টাতে যদি পুরোপুরি সফল হতে পারি তবে তো একটা বিরাট আলোড়ন ফেলে দেবো। তবে এও ঠিক কথা যে, আমাদের দেশে এ গবেষণাগার নেই। এই ধরো না, আমি যে ল্যাবরেটরীটা ব্যবহার করি তাতে কতটুকু হাত খুলে কাজ করতে পারি। মুরগীর খাঁচা, মাছের জলাধার, যন্ত্রপাতি সবকিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। আমার উদ্দেশ্য হ'ল যে, বিভিন্নরকম তাপমাত্রায়, আলোতে, বিভিন্নরকম শব্দে, খাবারে বিভিন্ন পরিমাণ খাবারে কিভাবে মাছ, মুরগী এবং অন্যান্য প্রাণীদের দেহের বৃদ্ধি হয়—তা জানা। হ্যাঁ, ভালো কথা, আমি খাবারের ব্যাপারে নানান ধরণের গাছের পাতার রসও ব্যবহার করছি।

এখানকার জঙ্গল সেদিক থেকে আমাদের উপকারে আসবে। এখানে নানাধরণের গাছ-গাছড়া আছে শুনেছি। কমল এবারে একটু মুখ খুলল—স্যার, আমি বলছিলুম কি—পাতার রস কিংবা অন্যান্য যে সব জিনিষ কোষবৃদ্ধিতে সাহায্য করে তার মধ্যে আলোর প্রভাবটা সম্ভবত বেশী। ঠিক নয় কি? প্রফেসার রায় বললেন—তা এখনই বলা যাচ্ছে না। মাধব উৎসুক হয়েই জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা স্যার, আলো গেল, তাপমাত্রার ব্যাপারে কি করছেন। প্রফেসার চটপট জবাব দিলেন—তাপমাত্রা বাড়ানোর কমানোর ব্যাপারে একটা কণ্ট্রোলার বোর্ড তৈরী করেছি, তাতে সুইচ টিপে ডায়াল ঘুরিয়ে দিলেই তাপমাত্রার রদ-বদল সম্ভব।

মাধব এবার সহজ হতে চাইল। বলল—স্যার, এত দূর জার্ণি করেছেন। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিন দুজনে। জঙ্গলে পথ দেখাবার জন্য একজন গাইড ঠিক করেছি। সকালে গাইডকে নিয়ে আসব। তারপর জঙ্গল ঘুরে দেখা যাবে, কি বলুন! আমি আসি। কমল বিদায় নিল। দুজনে রাত্রের খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

* * * *

সকালে গাইডকে সঙ্গে করেই এল মাধব। গাইড বাঙ্গালী। সোজাসুজিই প্রশ্ন করল—এর আগে কখনও জঙ্গলে ঢুকেছেন? দেখুন স্যার, আমাদের কাজই হ'ল আপনাদের সাহায্য করা। কিন্তু আসামের এই জঙ্গল মানেই তো বুঝতে পারছেন। এদ্দিন ডিউটি করেও একফোঁটা ভয় কমেনি। বরং কি সব সাংঘাতিক জিনিষ, চোখে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আর ইয়া বড় দৈত্য মার্কা একটা বনমানুষ বেরিয়েছে।

খুউব সাবধান মশাই। সন্ধ্যে হ'লে আর আমি ওখানে নেই। ছেলেপিলের সংসার। চাকরী করতে গিয়ে কি প্রাণটা বেঘোরে খোয়াব? প্রফেসার রায়ের রহস্যসন্ধানী মনটা আনন্দে নেচে

উঠল। গাইড তো বেশ কিছুর সন্ধান দিয়ে ফেলেছে। তাহ'লে তার গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত প্রায়। হঠাৎ কমল প্রফেসারের কাছাকাছি হয়ে বলল—স্যার, জিম করবেটের দেশে পড়লুম নাকি? মাধব চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। এবার মুখ খুলল—স্যার, আপনি বহু অজানা তথ্য জানতে পারবেন। এমন হতে পারে যে আপনিই বিজ্ঞানীর জগতে একটা মোড় ঘুরিয়ে দিলেন।

প্রফেসার রায় বেশ হ্যাঁ হ্যাঁ করে উঠলেন। ধ্যাৎ কি সব বলছ তোমরা দ্যাখোই না কি করতে পারি। জিপে চেপে চললো—প্রফেসার রায়, কমল, মাধব, গাইড। পাহাড়িয়া এ রাস্তায় জিপ ছাড়া উপায় নেই। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছিল প্রত্যেকেরই। পাহাড় আর পাহাড়। সমস্ত পাহাড়টাই গভীর জঙ্গলে ঘেরা। আসামের জঙ্গলে হিংস্র প্রাণীর তো অভাব নেই। যে কোন মুহূর্তেই গণ্ডার, হাতী, ঘোড়া, বাঘ আক্রমণ করে বসতে পারে। বেশ খানিকটা গিয়েই জিপটাকে থামতে হল। উপায় নেই। এখন হাঁটার পালা। প্রফেসার রায় এবং কমল চোখের নজর বেশ তীক্ষ্ণই করে রেখেছিল। প্রফেসার কমলকে ঠেলা দিয়েই বললেন—দেখছো কমল, কত হরেক রকমের ফুল. প্রজাপতি, গাছপালা। চোখে না দেখে কি এর আনন্দ উপভোগ করা যায়? প্রাণীদের আওয়াজগুলোও কি সুন্দর? তবে কি নিস্তব্ধতা, গা ছমছম করে। গাইড বলল—না স্যার, ভয় নেই। যতক্ষণ বন্দুকটা আছে লড়ে যাব। তারপর ভাগ্যের কথা। প্রফেসার লক্ষ্য করলেন মাঠের উপর স্তরে স্তরে সাজানো নানা ধরণের প্রজাতির প্রাণীদের উপনিবেশ। দূর থেকে ঠিক ফোটা ফুলের মতোই দেখাচ্ছে। হঠাৎ একটি মোরগের চীৎকারে বনের ঠাণ্ডা পরিবেশটা কেটে গেল। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল সবারই। অর্থাৎ বনের মধ্যে মানুষ ঢুকেছে তা যেন সাবধান করে দিচ্ছে আর সব প্রাণীদের।

কমলের নজরে এল একটি বিচিত্র ধরণের ফুল। প্রফেসার রায়ের চোখাচোখি হতেই প্রফেসার বলে ফেললেন—এটা সাগরকুস্মুর

তোমাদের জেনে রাখা ভাল যে ফুলের মতো দেখতে হলেও এরা কিন্তু প্রাণী। পা চালাতে চালাতে এখন তারা অনেক গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। ইতিমধ্যে গাছে কিছু অজগর. বিষাক্ত সাপ· বিষাক্ত লতা, অদ্ভুত ধরণের চামচিকে, বাদুড়ের পরিচয় পেয়েছেন তারা। বিভিন্ন বন্য প্রাণীর হিংস্র আওয়াজও কানে শুনতে পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই কিছু ভয়ও লাগছিল তাদের। এর মধ্যে প্রফেসার রায়ের চোখে পড়ল বিভিন্ন রকমের স্পঞ্জ। তিনি আর না বলে থাকতে পারলেন না। বুঝলে মাধব, এই যে গাছের মতো দেখছো, এগুলো স্পঞ্জ। স্পঞ্জ সম্বন্ধে কিছু বলাটা ভাল মনে করছি। এতে তোমাদের উপকারই হবে। এরা আসলে বহুকোষী আর ডিপেনালাসটিক অর্থাৎ এদের শরীরটা দুটো স্তরে ভাগ করা আছে। এক্টোডারম্ এবং এণ্ডোডারম্। আবার এই দুটো স্তরে মেনোগ্লিয়া বা মেসেনকাইম থাকে। গোটা শরীরটায় অসংখ্য অসটিয়া নামের ছোট ছোট ফুট থাকে। শরীরের উপরটায় থাকে একটা বড় ফুট। একে বায়োলজিতে বলে অস্‌কিটলাম। এদের শরীরে কোন পোষ্টিক নালী থাকে না। এদের প্রজননের কার্যও কুসুমের মত যোনি ও অযোনি পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়। এরকম লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে আমরা আরও নতুন কত তথ্য হয়ত বা আবিষ্কার করতে পারব। মাধবের পক্ষে এসব বৈজ্ঞানিক ব্যাপার চট করে মাথায় কুলিয়ে ওঠা মুসকিল। তাই সে সহজভাবেই— বলল—স্যার আপনাদের এসব ব্যাপারে কি আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ? আপনি স্যার ঐ ন'ফুট বিরাট দৈত্য আকারের লোকটার ব্যাপারেও আমাদের কিছু বোঝাবেন। প্রফেসার রায় খুব নরম হয়েই বললেন—নিশ্চয় মাধব, তাইতো তোমার ডাকে ছুটে এসেছি এতদূর কমলকে সঙ্গে নিয়ে। কি কমল ইনটারেষ্টিং লাগছে না ক্রমশঃ? কমল বাধ্য ছাত্রের মতোই উত্তর করল—ইয়েস স্যার। এতক্ষণের সঙ্গী গাইড সমস্ত কিছুই গোগ্রাসে গিলছিল। তার চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। সে প্রকাশ করল নিজেকে। আমি

বলছিলাম কি, মানে শুনেছিলাম লোকের মুখে, লোকটা নাকি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছে।

প্রফেসার রায় নিজেকে সামলাতে না পেরে বল্লেন—ওফ্ গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। ওকে আমার খুঁজে পেতেই হবে। হঠাৎ বেশ কিছু দূরে—একটা মানুষের ছায়ামূর্তি যেন সরে গেল। সবারই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। ছায়াটা বেশ বড় তাও স্পষ্ট বোঝা গেল। কমল তার সাহসটা দেখাবার জন্য একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। —স্যার, আমি আর এক মিনিট দেরী করব না। আমি খানিকটা পথ একাই হেঁটে যাচ্ছি। আমি যদি দেখতে পাই, তবে সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করব, আপনারা ছুটে আসবেন। দু-চারটে এমনি জঙ্গল আমার এর আগে ঘোরা আছে। কিস্সু হবে না আমার। এই বলে দৌড়ে বনের বেশ খানিটা ভেতরে গিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। মাধব এবং গাইড দুজনেই একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল। অর্থাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও যেতে পারে।

* * * *

সত্যি সত্যিই কমল বনে ঢোকার পর থেকে বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেছ। আধঘণ্টা বাদে দুজনেরই টনক নড়ল।

প্রফেসার রায়—নাঃ, আর দেরী নয়। কমল নিশ্চয় পথ হারিয়ে ফেলেছে। ওকে খুঁজতে বেরুব নাকি?

মাধব—এই জঙ্গলে কি করে খুঁজবেন ওকে?

প্রফেসার রায়—আন্দাজে নয়, বুদ্ধি করে এগুতে হবে। দেখা যাক, কোনো চিহ্ন-টিহ্ন ফেলে গেছে কি না। আচ্ছা সামনে দেখছি তিনটে রাস্তা আছে। কোন্ পথে যে গিয়েছে কমল?

মাধব—ঐ রাস্তাটা দেখুন কেমন কেমন মাড়ানো মাড়নো মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে হেঁটে গেলে যে রকম অবস্থা হয়—অনেকটা প্রায় সেরকম অবস্থা।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, অন্য দুটো মাড়ানো নয়। কাজেই এ

রাস্তাতেই কমল গিয়েছে। অতএব···এগুনো যাক্ এ রাস্তা ধরে।

(ঐ রাস্তা ধরে কিছুদূর এগুবার পর)

প্রফেসার রায়—কি যে করি এখন? এখান থেকে আবার দেখছি বেশ কয়েকটা রাস্তা বেরিয়েছে। কোন রাস্তায় যে যাব?

মাধব—তাইতো!

প্রফেসার রায়—এ রাস্তাগুলো দেখছি মাটির। পায়ের ছাপও নেই কোনোটাতে। তবে?

মাধব—রাস্তাগুলোর গোড়াতে দেখছি ওয়ান, টু, ইত্যাদি লেখা আছে।

প্রফেসার রায়—তাহলে দেখো সঙ্কেতও নিশ্চয় রেখে গেছে কিছু।

মাধব—কিন্তু এই ওয়ান, টু, লেখাগুলো বোধ হয় কমলবাবুর নয়। কারণ এগুলো দেখছি বেশ গর্ত করে, পুরু করে, যত্ন করে লেখা। কমলবাবু এত সময় নিশ্চয় পাননি।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, তা ঠিক। তোমার যুক্তি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কমল কি তবে এখান থেকে হওয়া হয়ে গেল নাকি?

মাধব—আমিও তো তাই ভাবছি।

গাইড—(চীৎকার করে) স্যার, একটা রুমাল পড়ে রয়েছে এখানে।

মাধব—রুমাল! তাইতো! দেখি, দেখিতো!

প্রফেসার রায়—এ কার রুমাল?

মাধব—(রুমালটা উল্টিয়ে পাল্টিয়ে) রুমালের কোণে কি একটা লেখা আছে।

প্রফেসার রায়—(উত্তেজিতভাবে ঝুঁকে পড়ে) হ্যাঁ, আমি যা আন্দাজ করেছিলাম তাই। এ নির্ঘাৎ কমলের রুমাল। রুমালের কোণে 'ক' লেখা আছে। 'ক' মানে কমল। কমল 'ক' লেখেও ঠিক এইভাবে।

মাধব—কিন্তু এটা তো কোনো রাস্তার উপর ছিল না। ছিল এই গাছটার পাশে। রুমাল দেখে তো কমলবাবু কোন্ রাস্তায় গিয়েছে তা বোঝা যাবে না। যদি কোন রাস্তার উপরে থাকত, তাহ'লে না হয় বোঝা যেত, কমলবাবু ঐ রাস্তায় গিয়েছেন।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, তা ঠিক। শুধু এটুকু বোঝা যাচ্ছে কমল এই জায়গা পর্যন্ত এসেছিল। কিন্তু এরপরে গেল কোন্ রাস্তায়? উবে তো যেতে পারে না।

মাধব—গাইড, রুমালটা কোন্ গাছের নীচে পেয়েছো?

গাইড—আজ্ঞে, এই গাছটার নীচে।

প্রফেসার রায়—(উত্তেজিতভাবে) মাধব, লক্ষ্য করো, গাছের গায়ে আঁচড় কেটে কি সব লেখা আছে। কতগুলো সংখ্যা মনে হচ্ছে না!

মাধব—(গাছের কাছে গিয়ে) হ্যাঁ সংখ্যাই। ইংরেজীতে লেখা। তিন সারিতে লেখা। প্রতি সারিতে তিনটে করে।

প্রফেসার রায়—সঙ্গে সঙ্গে কাগজ বার করে সংখ্যাগুলো লিখলেন নীচের মতো :—

1	2	7
0		0
5	0	1

মাধব—স্যার নটা সংখ্যা নয়। আটটা। মাঝখানের ঘরটিতে কোন সংখ্যা নেই।

প্রফেসার রায়—পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে। নিশ্চয় ঐ ফাঁকা ঘরে এমন একটা সংখ্যা বসবে যার ফলে সোজাসুজি,

কোণাকুনি, লম্বালম্বি সংখ্যাগুলোকে যোগ করলে প্রতিক্ষেত্রেই যোগফল সমান হবে।

মাধব—আর, ঐ ফাঁকা ঘরের সংখ্যাটাই রাস্তার সংখ্যাটাকে বাত্‌লে দেবে। এ ধরণের ম্যাজিকঘরের কোড আমারও জানা আছে।

প্রফেসার রায়—কিন্তু সংখ্যাটা কি?

মাধব—সেটাই তো বের করতে হবে স্যার।

প্রফেসার রায়—কিন্তু এ ধরণের কোন সংখ্যা হতে পারে না।

মাধব—কেন? কেন স্যার?

প্রফেসার রায়—কারণ প্রথম সারির সংখ্যাগুলোর যোগফল দশ। দ্বিতীয় সারির সংখ্যাগুলোর যোগফল দশ করতে হলে ফাঁকা ঘরটাতে দশ বসাতে হবে। কিন্তু লম্বালম্বি যোগ করলে প্রথম কলমের সংখ্যাগুলোর যোগফল ছয়, তারপরেরটার বারো, তার পরেরটার আট।

মাধব—হ্যাঁ, ঠিকই তো। আমি খেয়ালই করিনি। প্রথম সারির সংখ্যাগুলোর যোগফল দশ আর তৃতীয় সারির সংখ্যাগুলোর যোগফল ছয়। অর্থাৎ প্রথম সারির যোগফলের সমান নয়।

প্রফেসার রায়—কিন্তু ছকটার ওপরে স্পষ্ট লেখা আছে 'রাস্তা' তবে ছকের সংকেত কিভাবে উদ্ধার করা যায়?

মাধব—তাইতো ভাবছি।

গাইড—স্যার, এদিকে তো সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অন্ধকার নেমে আসার আগেই জঙ্গল ছেড়ে বেরুতে হবে।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, রাতের জঙ্গল বড় ভয়ানক। ভাবতে গেলে সমস্ত শরীর যেন শিউরে ওঠে।

মাধব—(হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে) দেখে যান গাছের এদিকটাতে। এদিকে আর একটা ছক রয়েছে।

প্রফেসার রায়—কই? দেখি, দেখি। দাঁড়াও, এ ছকটাও টুকে নিই কাগজে।

প্রফেসার রায় কাগজে নীচের ছক টুকে নিলেন ঃ—

14	9	10
7		15
12	13	8

মাধব—(কাগজে ঝুঁকে পড়ে) দেখেছেন স্যার। এটাও ম্যাজিক-ঘর। ফাঁকা ঘরটাতে এগারো বসালেই দেখবেন আড়াআড়ি, লম্বালম্বি ও কোণাকুনি সংখ্যাগুলোর যোগাফলও প্রতি ক্ষেত্রে সমান। তেত্রিশ।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, ঠিকই তো। তবে কি এগারো নম্বর রাস্তায় গেলে কমলকে পাওয়া যাবে ?

মাধব—কিন্তু স্যার, গাছে এ ছকটার ওপরে লেখা আছে 'গাছের নীচের গুপ্তধন'। আমার মনের হয় আগের ছকে যে রাস্তার সংকেত আছে সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে বেশ কিছু নম্বর দেওয়া গাছ পাওয়া যাবে। তার মধ্যে এগারো নম্বর গাছের নীচে গুপ্তধন আছে।

প্রফেসার রায়—মনে হয় সন্ন্যাসী কমলকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছে। তার কাছেই এ ছক দুটো পেয়েছে কমল।

মাধব—তা হতে পারে। মোটকথা সন্ন্যাসীর সঙ্গে কমলবাবুর দেখা হয়েছে—এটা ঠিক। তার কাছ থেকেই তিনি এই ছক দুটো কোন রকমে জেনেছেন এবং আমাদের জ্ঞাতার্থে গাছের গায়ে লিখে গেছেন।

প্রফেসার রায়—সন্ন্যাসী যদি ধরেই নিয়ে গিয়ে থাকে, তবে এসব লেখার সময় পেল কি করে ? আর যদি সন্ন্যাসীর খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে থাকে তবে আমাদের জন্য অপেক্ষা করল না কেন ?

মাধব—হয়তো উনি ছক দুটোর সংকেত ধরতে পেরেছেন। আর একা গুপ্তধন উদ্ধারের লোভ সংবরণ করতে পারেননি।

প্রফেসর রায়—কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে। যাই করুক কমল, এখন তো ফিরে আসা উচিৎ। শেষকালে বাঘ, সিংহের পেটে যাবে যে আর না হলে! কোন্ রাস্তায় গেলে যে তার সন্ধান পাবো তাও তো বুঝতে পারছি না।

মাধব—তবে কি তাড়াতাড়ির ঠ্যালায় উনি ছক দুটোর উপরের লেখা পাল্টাপালটি করে ফেলেছেন।

প্রফেসার রায়—তুমি কি বলতে চাইছ?

মাধব—মানে—পরেরটাই হয়তো রাস্তার সংকেত। অন্যটা গুপ্তধনের। গুপ্তধনের সংকেতটা যার জন্য বেশী জটিল।

প্রফেসার রায়—তবে কি তুমি এগারো নম্বর পথে যেতে বলছ?

মাধব—হ্যাঁ, কিন্তু সন্ধ্যে তো প্রায় হয়ে আসছে। স্যার, আজ বরং ফিরে যাওয়া যাক। কাল গাইড এসে এই এগারো নম্বর পথে খোঁজ করবে।

প্রফেসার রায়—কিন্তু কমল যে রয়ে গেল?

গাইড—ফিরে চলুন বাবু, বাঘ সিংহকে প্রাণটা দিতে পারব না কিন্তু।

প্রফেসার রায়—তবে তাই চলো। ফিরে চলো আস্তানায়। জঙ্গল থেকে বেরুনো যাক। কাল গাইড সকাল সকাল এসে কমলের খোঁজ করবে। বুঝলে তো গাইড, এই এগারো নম্বর রাস্তায় যাবে। অন্ধকার হবার আগেই তারা বেরিয়ে পড়ল জঙ্গল থেকে।

*　　　*　　　*　　　*

কমল নিরুদ্দেশ হবার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। কাজে ঠিকমতো মন বসাতে পারছেন না প্রফেসার রায়। তবুও কাজ করতে হচ্ছে। গাইডের উপর ভার দেওয়া হয়েছে প্রতিদিন সে জঙ্গলে ঢুকবে ও কমলকে খুঁজবে। খুঁজতে হবে ঐ এগারো নম্বর পথে। কারণ পথের সংকেত দেওয়া ছকটার রহস্য এখনো উদ্ধার করা যায়নি।

জঙ্গল থেকে ফেরার সময় বেশ কিছু ভেষজ উদ্ভিদ ইপিকাফ্ ইত্যাদির পাতা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন তিনি। কোন্ পাতায় কি রাসায়নিক আছে, মুরগীদের দেহের বৃদ্ধিতে তাদের কি প্রভাব ইত্যাদির ওপরে পরীক্ষা চালাচ্ছেন প্রফেসার রায়। সঙ্গে সঙ্গে মুরগী ও মাছের দেহের বৃদ্ধিতে আলোর, রঙের, তাপমাত্রার, শব্দের, খাবারের পরিমাণের কি প্রভাব তাও লক্ষ্য করছেন।

মাধব—মাছের এই তিনটে জলাধারে মোট কটা মাছ আছে?

প্রফেসর রায়—মাত্র আঠারোটা। ছ'টা ছ'টা করে। ছ'টার মধ্যে তিনটে বড়, রুই, কাতলা, মৃগেল ; তিনটে ছোট রুই, কাতলা, মৃগেল। প্রতিটি আধারেই বড় মাছগুলো একই আকারের আর ছোট মাছগুলো একই আকারের। মুরগীর তিনটে খাঁচাতেও আছে এরকম মোট তিন জাতের আঠারোটা মুরগী।

মাধব—লাল আলো যে জলাধারে আছে তার মাছগুলোই দেখছি সবচাইতে বেশী বেড়েছে। এ থেকে তো এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না যে লাল আলোতেই মাছেরা সবচাইতে বেশী বাড়ে।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, তা ঠিক। কারণ এই বৃদ্ধির জন্য মাছের কোষের জিন দায়ী কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ আলোগুলোর স্থান বদল করতে হবে। অন্য সব পরিবেশের সর্ত সমান রাখতে হবে। প্রতিবার যদি লাল আলো যে জলাধারে আছে সেই জলাধারের মাছই সবচাইতে বেশী বাড়ে তবে বুঝতে হবে লাল আলোই মাছের সব চাইতে বেশী বৃদ্ধির জন্য দায়ী। মুরগীদের ক্ষেত্রেও এভাবে পরীক্ষা চালাতে হবে।

* * * * *

কিছুদিন পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেল সত্যি সত্যি লাল আলোতে সব মাছেরই বৃদ্ধি বেশী হচ্ছে। এবার সব জলাধারে লাল আলো রেখে, অন্যান্য সর্ত প্রতি জলাধারে এক রেখে তাপ-মাত্রার অদলবদল করে দেখা গেল চল্লিশ ডিগ্রী, ত্রিশ ডিগ্রী ও

পঞ্চাশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে ত্রিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেই মাছের বৃদ্ধি বেশী হচ্ছে। অবশ্য এ থেকে কোন্ তাপমাত্রায় সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি হবে তা কিন্তু বোঝা গেল না। মুরগীদের ক্ষেত্রেও দেখা গেল পাটল বর্ণের আলোতে সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি হচ্ছে। ত্রিশ ডিগ্রী, চল্লিশ ডিগ্রী ও পঞ্চাশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে চল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেই বেশী বৃদ্ধি হয় তাদের। তবে কোন্ তাপমাত্রায় বৃদ্ধি সবচাইতে বেশী হয় তা কিন্তু বোঝা গেল না। শব্দের ক্ষেত্রেও একটু কর্কশ ও দ্রুতলয়ের শব্দে দেখা গেল, মাছেদের ও মিষ্টি দ্রুতলয়ের শব্দে মুরগীদের বৃদ্ধি বেশী হচ্ছে। তবে সেই শব্দের কত ফ্রিকোয়েন্সিতে সে বৃদ্ধি সবচাইতে বেশী হচ্ছে তা বোঝা গেল না। খাবারের ক্ষেত্রেও দেখা গেল কোন কোন পাতার রসে বৃদ্ধি বেশী হচ্ছে। কোনটাতে কম হচ্ছে। খুব বেশী খেলে ও খুব কম খেলে বৃদ্ধি কম হচ্ছে। মাঝামাঝি একটা পরিমাণে বৃদ্ধি বেশী হচ্ছে। তবে কোন্ খাবার ঠিক কত পরিমাণ রোজ খেলে বৃদ্ধি সবচাইতে বেশী হবে তা কিন্তু বোঝা গেল না।

মাধব—স্যার, তা'হলে সব পরীক্ষাই তো একটা জায়গায় এসে ঠেকে যাচ্ছে।

প্রফেসার রায়—আচ্ছা, প্রতিক্ষেত্রে রেখাচিত্র এঁকে দেখা যাক, তবেই বৃদ্ধির ফাংশনকে জানা যাবে এবং কোন সর্তে সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি হবে তাও জানা যাবে।

মাধব—তাও স্যার, আঁকার চেষ্টা করেছি। তবে রেখাচিত্র এমনি অদ্ভুত ধরণের হচ্ছে যা দেখে বৃদ্ধির ফাংশনকে মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। আর তার ফলে কোন সর্তে সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি হবে তা বের্ করা যাচ্ছে না। কোন সর্তে সবচাইতে বেশী বৃদ্ধি হতে পারে, তা অনুমান করছি। তবে সেটা ঠিক কিনা জানি না।

প্রফেসার রায়—কমলের চিন্তা আমাকে এত অস্থির করে রেখেছে যে এ বিষয়ে আর বেশী ভাবতে পারছি না।

মাধব—হ্যাঁ, কমলবাবুর চিন্তা আমাকেও মাঝেমধ্যে অস্থির করে

তোলে। এতদিন হয়ে গেল কোন খোঁজখবর নেই কমলবাবুর। গাইড প্রতিদিনই সকালে যাচ্ছে জঙ্গলে, প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে বলছে—পাওয়া গেল না কমলবাবুকে। আসলে এগারো নম্বর পথ বিরাট বড়। শেষ পর্যন্ত কোনদিনই যেতে পারছে না। কিছুদূর গিয়েই সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

প্রফেসার রায়—তাহলে এক কাজ করা যাক। যে যে সর্তে বৃদ্ধি সবচাইতে বেশী হবে আশা করছি—সেই সেই সর্তে মাছগুলোকে ও মুরগীগুলোকে রেখে চলো আমরাও যাই গাইডের সঙ্গে। যতদিন না কমলকে পাওয়া যায় ততদিন আমরা জঙ্গলেই কাটাব। বেশ কিছু খাবারদাবার নিয়ে যাব। আর বনের ফলমূল তো আছেই। মাছ আর মুরগীগুলোকেও বেশ কয়েকদিনের খাবার দিয়ে যাব।

মাধব—তাই ভালো। তাছাড়া ভয়েরও কিছু নেই। আপনার বন্দুক, আমার ছোরা, আর গাইডের লাঠি আছে সঙ্গে।

* * * * *

স্ত্রীর হাজার বারণ সত্বেও প্রফেসার রায় আগের পরিকল্পনা মতো মাধব ও গাইডের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন জঙ্গলের পথে।

প্রফেসার রায়—আমরা কি ভুল পথে এলাম? এগারো নম্বর পথে যেতে হলে তো সেই বড় বটগাছটার পাশ দিয়ে যেতে হবে। ওটা তো দেখছি না।

মাধব—তাই তো!

গাইড—স্যার, এদিক দিয়ে আসুন।

(আরো কিছুদূর এগুবার পর)

গাইড—ওই তো স্যার সেই বটগাছ।

মাধব—হ্যাঁ, এ সেই বটগাছ। এতবড় বটগাছ এর আগে কখনও দেখিনি। বয়সও বেশ কয়েকশো বছর হবে।

প্রফেসার রায়- গাছেরগুঁড়ি পরীক্ষা করলে অবশ্য বয়সটা নির্ভুলভাবে জানা যেত। গুঁড়ি কাটলে যতগুলো পাক খাওয়া রেখা পাওয়া যাবে তার ওপরে নির্ভর করবে ঐ গাছের বয়স।

মাধব—এদের এত বড় আকারের জন্য দায়ী কি শুধু জিনই।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, ততো বটেই। তবে পরিবেশও এই জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

গাইড—স্যার, এরার এই ডানদিক দিয়ে কিছুটা গেলেই এগারো নম্বর পথ পাওয়া যাবে।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, এখন চিনতে পেরেছি। কিছুক্ষণ পরে তারা এগারো নম্বর পথ ধরল। কিছুদূর গিয়েই অন্ধকার নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে তারা খুব উঁচু একটা গাছের ডালে উঠে বসল। বসবার আগে ঐ গাছের চারিদিকে ভাল করে আগুন জ্বালিয়ে দিল। এমন ভাবে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা হ'ল যাতে সারারাত থাকে সে আগুন। আগুনের মালমশলা তারা আগের থেকেই জোগাড় করেছিল। প্রফেসার রায়ের এধরণের জঙ্গলে রাত কাটাবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। গাইড ও মাধবের এ ধরনের অভিজ্ঞতা অবশ্য এর আগে হয়েছে। যতই রাত গভীর হতে লাগলো জঙ্গল ততই যেন বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো। নানারকম পশুর বীভৎস চিৎকার। প্রফেসার রায়ের গা কিরকম ছমছম করে উঠলো। ভয়, বিভীষিকা ক্লান্ত মনের দেশে কেমন যেন ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করতে পারলেন না। গাছে চাপবার সময় তারা রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেতো প্রায় পাঁচটায়। খিদেও বেশ পেয়েছে। ঘুমও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। কিন্তু ঘুমুনো চলবে না। যদিও শরীরটাকে গাছের গালে ভাল করে বেঁধে নিয়েছেন, তবুও ভয় —ঘুমুলেই যদি পড়ে যান নীচে।

সে রাতে ঘুম হ'লো না ঠিক, তবে পরের রাত থেকে তারা একটু করে ঝিমিয়ে নিতে শুরু করলেন। সবাই একসঙ্গে নয়। পালা করে। দিনের বেলা পথ চলার সময় যখনই যে ফলমূল পেতেন তাই ঝোলায় ভরে নিতেন। খাবারের অভাব তাই হয়নি।

প্রফেসার রায়—এগারো নম্বর পথ যে শেষই হতে চায় না। বেশ কয়েকদিন ধরেই তো হাঁটছি।

মাধব—হ্যাঁ, তবে স্যার একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন ?

প্রফেসার রায়—কি ?

মাধব—জঙ্গল প্রথমে ক্রমশঃ গভীর হচ্ছিলো। এখন কিন্তু আবার পাতলা হওয়া শুরু করেছে। কমলবাবু এ রাস্তাতে কোন চিহ্ন রেখে যাননি ঠিকই, তবে মনে হয় আমরা সেই গুপ্তধনের দেশেই যাচ্ছি।

প্রফেসার রায়—কি করে বুঝলে ?

মাধব—মনে হয় এখানটাতে আগে বসতি ছিল। ভূমিকম্পেই হোক, আর যে কোনো কারণেই হোক এই অঞ্চলটা নীচে নেমে যায়। পরে সেই ধ্বংসস্তুপের ওপরই মাটি পড়ে এইসব গাছপালা জন্মেছে, যার জন্য এদের বয়সও অনেক কম। আর এখানেও জঙ্গলও মনে হয় কিছুটা ফাঁকা।

প্রফেসার রায়—কিন্তু জমিটাওতো কিছু নীচু হওয়া উচিৎ। কিন্তু সে লক্ষণ তো মোটেই দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাক, কি কপালে আছে।

মাধব—আরে বাবা সাপ ! গোখরো সাপের ছানা।

গাইড—(হো হো করে হেসে) ভয় পাবার কিছু নেই। এটা তো কচু জাতীয় সর্প উদ্ভিদ। এভাবে তারা আত্মরক্ষা করে।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ, এদের ভেতরে আত্মরক্ষার কৌশলগুলো জানলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। আসামের জঙ্গলে কালিমা নামে একধরণের প্রজাপতির ডানা শুকনো পাতার মত। লোকে গাছের পাতা মনে করে ভুল করে। চলন্ত কাঠি নামে এক ধরণের পতঙ্গ আছে যাদের দেখতে ঠিক মাটির ডেলার মতো। লোকে একে মাটির ডেলা বলে ভুল করে।

* * * * * *

(কয়েকদিন বাদে, রাতে সবাই গাছের ডালে।)

মাধব—স্যার, কমলবাবুর কি হ'লো ? কোন চিহ্নটিহ্নও পাওয়া

গেল না। এগারো নম্বর রাস্তা তো শেষও হয়ে গেল। এখান থেকে আবার গভীর অরণ্য।

প্রফেসার রায়—হ্যাঁ ; সংকেত অনুযায়ী তো সেরকম নম্বর দেওয়া কোন গাছও পেলাম না। তবে কি যে ছকটার রহস্য আমরা উদ্ধার করতে পারিনি সেটাই রাস্তার সংকেত দিচ্ছে!

মাধব—কিন্তু ছকটার রহস্যতো উদ্ধার করা গেল না।

প্রফেসার রায়—কাল সকালে ভাবা যাবে। বড্ড ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমিয়ে নিই।

মাধব—আমারও বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

প্রফেসার রায়—তবে ঘুমিয়েই নাও। গাইড একটু জেগে থাক। ঘোড়া তিনপায়ে ঘুমায়, বক একপারে ঘুমায়, শুস্নী শ্যাক ও বাবলা গাছ রাতের বেলা ঘুমায়, কোনো গাছ দিনে ঘুমায়, মানুষ পঞ্চাশ বছরের চব্বিশ বছরই ঘুমিয়ে কাটায় ইত্যাদি ইত্যাদি আলোচনা করতে করতে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন গভীর নিদ্রায়। কতক্ষণ তারা ঘুমিয়েছেন তার ঠিক নেই। ক্লান্তিতে বোধহয় ঘুমটা একটু বেশীই হয়েছে। হঠাৎ কিসের ঝটপট আওয়াজে প্রফেসার রায়ের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙেই দেখলেন চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। গাছের চারপাশে জ্বালানো আগুন কখন নিভে গেছে খেয়ালই নেই। তবে কি কাঠ কম ছিল গতকাল! অন্ধকারের মধ্যে গাইডকে ডাকলেন প্রফেসার রায়। কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। তবে কি গাইডও ঘুমিয়ে পড়ল! আবার ডাকলেন গাইডকে। গাইডের কোন উত্তর এলো না। এলো মাধবের উত্তর। চিৎকারে তার ঘুমও ভেঙে গেছে।

মাধব—কি স্যার, কি হ'লো? এত অন্ধকার কেন?

প্রফেসার রায়—কিসের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। তারপরই দেখি এই অবস্থা। আগুন নিভে গেছে। গাইডেরও কোন সাড়াশব্দ নেই।

সারাটা রাত তারা দুরুদুরু বুকে ভয়ের মধ্যে কাটিয়ে দিল।

সকালের আলো যখন পৌঁছুলো সে জায়গায়, ভয়ে তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সমস্ত শরীর দিয়ে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। গাছ থেকে নেমেই দেখল গাইড নেই। নীচে চাপ চাপ রক্তের দাগ। গাইডের জামার ছেঁড়া কিছু কিছু অংশ এদিক ওদিক ছড়ানো। প্রফেসার রায়ের কাছে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে এলো গত রাতে আগুন নিভে যাওয়াতে গাইড আগুন জ্বালাতে নিশ্চয় নীচে নেমেছিল। তখনই কোন হিংস্র প্রাণীর হাতে তার ঐ অবস্থা হয়েছে। নিজেকে বাঁচাবার নিশ্চয় খুব চেষ্টা করেছিল বেচারা। সেই হুটোপুটির আওয়াজেই তার ঘুম ভেঙেছিল গতরাতে। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি চলল। ডাকাডাকি হ'লো। গাইড আর ফিরে এলো না। মাধবের দুচোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল।

মাধব—স্যার, ওর বউ, এতগুলো ছেলেমেয়ের কি হবে?

প্রফেসার রায়—এখন শোকের সময় নয়। আমাদেরও প্রাণে বাঁচতে হবে তো। গাইডও নেই। এখন যত তাড়াতাড়ি আস্তানায় ফেরা যায় তার ব্যবস্থা কর।

মাধব—কমলবাবুর খোঁজ আর করবেন না?

প্রফেসার রায়—না, আর নয়! চলো ফেরা যাক। গিয়ে দেখবো কমল হয়তো আগেই ফিরেছে আস্তানায়। বেশ কয়েকদিন হাঁটার পর তারা এগারো নম্বর পথের গোড়ায় পৌঁছুলো। মাধবের হঠাৎ চোখ গেল রহস্যময় ছকটার দিকে যেটার রহস্য রহস্যেই থেকে গেছে।

মাধব—আরে, ছকটা যে পাল্‌টিয়ে গিয়েছে।

প্রফেসার রায়—তাইতো! আগে ছিল—

1	2	7
0		0
5	0	1

আর এখন হয়েছে ঃ—

7	2	3
0		8
5	6	1

অন্য ছকটা ঠিকই আছে।

মাধব—স্যার, এটাও তো ম্যাজিক ঘর। ফাঁকা ঘরটাতে 'চার' বসালেই লম্বালম্বি, আড়াআড়ি, কোণাকুনি সংখ্যাগুলোর যোগফল প্রতিক্ষেত্রেই বারো হচ্ছে।

প্রফেসার রায়—আসলে আমরা প্রথম যখন দেখেছিলাম তার কিছু আগে গাছে আঁচড় কাটায় সংখ্যাগুলোর সব অংক প্রকাশ পায়নি। যেমন 7কে 1, 3কে 7, 8কে 0, 6কে 0 দেখিয়েছে। এখন শুকিয়ে পুরো সংখ্যা দেখা যাচ্ছে। আসলে এবার যখন এগারো নম্বর পথে ঢুকি তখন একটু খেয়াল করলেই ভুলটা ধরা পড়তো।

মাধব—তবে তো চার নম্বর পথেই যেতে হবে।

প্রফেসার রায়—এখন আর গিয়ে কাজ নেই। সোজা আস্তানায় চলো। তোমার বৌদি, বাচ্চাটা যে কেমন আছে ভগবান জানেন।

মাধব—সমাধান পেয়েও যাবেন না?

প্রফেসার রায়—না, এখন গাইডও নেই, যে কোন সময় আমাদের বিপদ হতে পারে। তাছাড়া আমরা তো এখানে গুপ্তধনের সন্ধানে আসিনি। এসেছিলাম কমলের সন্ধানে। কমল হয়ত আমাদের আগেই ফিরেছে ডেরায়। চলো ফেরা যাক।

* * * * * *

প্রফেসার রায় জঙ্গলে যাবার পর বেশ কয়েকদিন হয়ে গিয়েছে।

প্রতিদিনই তার স্ত্রী আশা করেন আজ হয়ত স্বামী ফিরবেন। কিন্তু ফিরতে না দেখে ক্রমশ তার চিন্তা বেড়েই চললো। শেষকালে একটা কিছু হলো না তো ? না, আর ভাবা যায় না। ছেলে শঙ্করও রোজ বাবার খোঁজ করে। 'বাবা' 'বাবা' করে মাকে অস্থির করে তোলে।

প্রফেসার রায় যখন ফিরলেন তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ডেরায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। স্ত্রী কি করবেন আর কি করবেন না বুঝে উঠতে পারলেন না। এত আনন্দের মধ্যেও দুঃখের সুরটুকু রয়ে গেল। কমলকে তো পাওয়া গেলই না, গাইডকেও আর কোনদিন পাওয়া যাবে না।

খবরটা মাধবকেই দিয়ে আসতে হল। শুনে মাধবের স্ত্রী কান্নাকাটি করেনি বেশী। কেমন পাথরের মতো বসে রয়েছে এককোণে। বাচ্চাগুলো 'বাবা আসবে না আর' কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের ধারণা বাবা আবার আসবে। আবার তাদের আদর করবে। আবার ওদের জন্য লজেন্স নিয়ে আসবে। জামা প্যাণ্ট কিনে দেবে। হৃদয়ের সমস্তটুকু স্নেহ ঢেলে দেবে ওদের উপরে। হায়রে অবোধ শিশু, ওরা বুঝল না ওদের সবচাইতে বড় সম্বল চলে গেল। সবচাইতে বড় অবলম্বন খসে পড়লো।

প্রফেসার রায় শংকরকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন। এ কয়দিন জঙ্গলে ভালো ঘুম হয়নি, বিশ্রাম হয়নি, ক্লান্তিতে আর ঘুমে তার দুচোখ বুজে আসছিল। কোন রকমে একটু স্নান সেরে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোতে যাবেন এমনি সময় মাধব ছুটে এল।

মাধব—স্যার, দেখেছেন, একটা মুরগী কি বিরাট বড় হয়ে উঠেছে। এতবড় যে খাঁচায় ধরছে না ঠিকমতো। ওর জন্য বড় খাঁচা করতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

প্রফেসারের স্ত্রী—ওঃ তোমাকে বলতেই ভুলে গিয়েছি। দুদিন

আগে ব্যাপারটা সবার নজরে পড়ে। ঐ মুরগীটা এত বড় হয়েছে যে খাঁচায় ধরছে না।

প্রফেসার রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন গবেষণাগারে। মুরগীটাকে দেখে তো তার চক্ষু চড়কগাছ। এতবড় মুরগী কি করে সম্ভব। এযে দানবাকৃতি। আনন্দে তার দুচক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তা'হলে তো মুরগীটাকে যে সর্তে রেখে গিয়েছিলেন সেই সর্তই সবচাইতে বেশী বৃদ্ধির জন্য দায়ী। পাটলবর্ণের আলো জ্বালানো ছিল। একি! লাল আলো এলো কি করে! তাপমাত্রা ছিল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। তাপমাত্রা এখন বিয়াল্লিশ ডিগ্রী! আশ্চর্য ব্যাপার। শব্দ পর্যন্ত পাল্‌টিয়ে গিয়েছে! খাবার প্রায় খায়ইনি! কি ব্যাপার তাহ'লে গাছের পাতার রস খেয়ে এও ক্লোরোফিল তৈরী করে তবে কি গাছের মতো নিজের খাবার নিজের শরীরেই তৈরী করছে।

মাধব—এ কি করে সম্ভব স্যার? কেউ কি তবে এসেছিল গবেষণাগারে?

প্রফেসার রায়—এখানে তো সবার প্রবেশই নিষেধ ছিল। তোমার বৌদিকেও বারণ করে গিয়েছিলাম। কে তবে এগুলো পাল্টালো? কবে পাল্টালো?

প্রফেসার রায়ের স্ত্রী—শংকর কিন্তু ঘুরঘুর করত এঘরের চারদিকে। আর ঐ ভাঙ্গা জানালাটা দিয়ে ভেতরেও ঢোকা যায়। তুমি শংকরকে জিজ্ঞেস করে দেখো একবার।

প্রফেসার রায়--কিরে শংকর, তুই ঢুকেছিলি ভেতরে?

শংকর—না ঢুকিনি তো।

প্রফেসার রায় শংকরের হাত খানা চেপে ধরতেই শংকর হঠাৎ বলে বসলো—আমি তো শুধু একদিন ঢুকেছিলাম। তবে কিছু করিনি।

প্রফেসার রায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন—না কিছু করিনি। তোকে আজ শেষ করে ছাড়বো। আমার সব সাধনা নষ্ট করে

দিলি। তুই নিশ্চয় মজা করে এটার সুইচ ওটার সুইচ ঘোরাতিস। কখন কি করেছে ভগবান জানে। প্রফেসার রায়ের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল শংকরের উপর। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চড়, কিল, ঘুষি মারলেন শংকরকে। শেষকালে তার স্ত্রী তার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল শংকরকে।

শংকরকে এত কোনদিনই মারেননি প্রফেসার রায়। শংকরের গায়ে এর আগে হাতই তুলেছেন খুব কম। কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল ছেলেটা।

প্রফেসার রায়ের মাথার ঠিক নেই এখন। আর কিছু চিন্তা করতে পারলেন না তিনি। ঘুমতে গেলেন। ঘুমবার আগে মাধবকে বলে গেলেন মুরগীটাকে খাঁচা থেকে বের করে শেকল দিয়ে যেন তার ঘরের পাশের কোন খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। খাঁচা থেকে না বার করলে ও মারা যেতে পারে।

* * * *

প্রফেসার রায় কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন খেয়ালই নেই। রাত্রে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচিতে আর শংকরের 'বাপি বাঁচাও বাঁচাও' আর্তনাদে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গিয়ে তার চক্ষু চড়কগাছে উঠল। তখন রাত শেষ হয়নি। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আলো হাতে দু একজন কর্মচারী এসে উপস্থিত হ'লো।

যা দেখলেন তা দেখে প্রফেসার রায় দিশেহারা হয়ে গেলেন। কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। শংকরকে কামড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে সেই দানবকৃতি মুরগীটা। রক্তে ভেসে গিয়েছে চারদিক। শংকরের তখন শেষ অবস্থা। কোনরকমে চোখ দুটো খুলে আড়ষ্ট স্বরে বললো—'বাপি আমি একদিনই ঢুকেছিলাম ওঘরে। গাইডকাকুর ছোটছেলেই রোজ ঢুকতো ওঘরে। ওই সুইচগুলো জ্বালাতো নেবাতো। আমি শুধু একদিন

ওঘরে ঢুকেছিলাম। তবে কিছু করিনি। বিশ্বাস করো বাপি। বিশ্বাস……' আর বলতে পারল না শংকর। ঢলে পড়ল মাথাটা। তখনও প্রাণ আছে মনে হ'ল। কোনরকমে সবাই মিলে ছাড়িয়ে আনলো শংকরকে। মুরগীটাকে লোহার রডের বেশ কয়েক ঘা দিতে হ'লো। মুরগীটাও ঢলে পড়ল।

* * * * *

মুরগীটা মারা গেল। মারা গেল শংকরও। আরো কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল শংকর অজ্ঞান অবস্থায়। বাপির মিষ্টি কথা আর শুনতে পেল না। আদর তো পেলই না। শংকরের মার অবস্থা পাগলের মতো। সেদিন বিকালেই প্রফেসার রায় বাড়ী ফিরবেন ঠিক করলেন। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। বিকালে ট্রেনে তুলে দিতে এল মাধব। মাধবের তুচোখে জল। তার স্যারকে সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা নেই। প্রফেসার রায়ের স্ত্রী যেন কাউকে খুঁজছেন—ওগো আমার শংকর তো এলো না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন শংকরের মা। প্রফেসার রায়ও আর স্থির থাকতে পারলেন না। তুচোখে জলের বন্যা নেমে এল। সমস্ত কথা মনে পড়ল তার। আসার সময় আরো তুজন এসেছিল তাদের সঙ্গে—কমল, শংকর। কমলের তো কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। আর শংকর। আবার জলের ধারা নেমে এল চোখে। কাল কেন যে মারলেন ওকে এমনি অমানুষের মতো। আর না হলে তো এসব কিছুই হতো না। বাপির কাছে অত মার ছেলেটা কখনও খায়নি। অভিমানে, তুঃখে সে রাতে নাকি ছেলে খায়ইনি। মার সঙ্গে কিছুক্ষণ শুয়ে মা ঘুমিয়ে পড়তেই নাকি ঘরের বাইরে গিয়ে শুয়েছিল। ঘুমিয়েও পড়েছিল বোধহয়।

মুরগীটার শেকলটা খুব শক্ত ছিল না। শেকল ছিঁড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় কামড়ানো শুরু করেছিল শংকরকে। এত ছোট, অত তুর্বল ছেলে সইতে পারবে কেন সে কামড়! ভয়েই বেশী কাবু হয়েছিল। একটু আদর করতে পারলেন না ছেলেটাকে। প্রফেসার

রায়ের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল। অভিমান নিয়েই চলে গেল ছেলেটা। শেষ কাজ মাধবরাই করেছে।

ট্রেন ছাড়ার হুইশেল দিল। 'শংকর নেই'—এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না প্রফেসার রায়। দূরের ছোট্ট কালো জঙ্গলটা যেন ক্রমশঃ বড় হয়ে ঢেকে ফেলছে চারধার। অস্পষ্ট হয়ে আসছে চারদিক। শংকরের ছোট্ট সুটকেশটার দিকে তাকিয়ে আবার দুচোখ ভরে এলো জলে। ছোট্ট সুটকেশের ছোট্ট মালিক কোথায়? কোথায়? সুটকেশটাকে বুকে টেনে নিলেন প্রফেসার রায়। ওটার মধ্যেই শংকরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে চাইলেন।

ট্রেন চলা শুরু করলো। মাধবের হাত ছুঁয়ে বিদায় জানালেন প্রফেসার রায়। দুচোখে জলের ধারা। বুকে মরুর শূন্যতা। এই সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রফেসার রায়! মাধবের মাষ্টারমশাই। সেই কাঠিন্য আজ কোথায় গেলো! বাচ্চা ছেলের মত কাঁদছেন তিনি। বুকে জাপটানো সুটকেশটা। মাধব তার চাপতে পারলো না জলের ধারা। চীৎকার করে কেঁদে উঠলো মাধব। সেই কান্নার শব্দ ছাপিয়ে গেল ট্রেনের শব্দ। এগিয়ে চললো ট্রেন।

একটা থমথমে পরিবেশ। ঘর অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে। চারদিকের ফাঁকফোঁকড় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যাতে একটুও আলো না এসে পড়ে ঘরের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে ছুটো প্রাণী। আমি আর বিকাশ প্ল্যানচেট্ করছি। পাঁচ বছর আগে আমার মা মারা গেছেন। তার স্মৃতি মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি না। অহরহ তার কথা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। তাকে যে অনাদর করেছি, অবজ্ঞা করেছি সেইসব অবহেলাগুলো ব্যথার মালা হয়ে আছে আমার বুকে। এক একসময় মালার এক এক অংশে টান পড়ে। টনটন করে ওঠে বুকটা।

তাকে কাছে পাওয়ার জন্য মন আকুল হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার সময় তাকে তো কাছে পেতে ইচ্ছে করতো না। তার কথা এত করে মনে পড়তো না। তবে কি অভাবেই তার অস্তিত্ব ধরা পড়ছে!

আমি বিজ্ঞানী হ'লেও বিশ্বাস করি—মৃত্যুতেই মানুষের শেষ হয় না। মৃত্যুর পরেও কিছু আছে। এ নিয়ে বন্ধুরা আমাকে হাসি ঠাট্টা করে। কমল বিজ্ঞান ছাড়া কিছু মানে না। তাকে একদিন বলেছিলাম বিজ্ঞান মানে তো বিশেষ জ্ঞান, পাঁচটি ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের বাইরেও তো কিছু থাকতে পারে। ধর্ না, তোর অনুভূতি যদি প্রখর হয়, তবে তো সেটা ইন্দ্রিয় হিসেবেই কাজ করবে। তখন দেখবি এমন অনেক জিনিস জানতে পারছিস যা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সীমানার বাইরে। আসলে বিজ্ঞান এ নিয়ে এখনো তেমন মাথা ঘামায়নি। মাথা

ঘামালে দেখবি এমন অনেক জিনিস জানা যাচ্ছে যা কল্পনাও করা যায় না।

কমল হেসে বলেছিল—তা বলে মৃত্যুর পরে! অসম্ভব। মৃত্যুর পরে কিছু থাকা সম্ভব নয়। দেহটা পুড়িয়ে দিলে তো কিছু ছাই পড়ে থাকবে। আর কার্বন ডাই-অক্সাইড, ফসফরাস ইত্যাদি গ্যাস উপরে উঠে যাবে।

বাধা দিয়ে বলেছিলাম—কিন্তু সে তো দেহটা পোড়ালে। যে মুহূর্তে প্রাণহীন হয় দেহ—সেই সময় একটা শক্তি বেরিয়ে যায় দেহ থেকে—এটা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। এ নিয়ে একটা পরীক্ষাও হয়েছিল বিদেশে। যে মুহূর্তে দেহ প্রাণহীন হয়, সেই মুহূর্তে দেখা যায় দেহের ওজন কিছুটা কমে যায়। আসলে সবার মধ্যে এক একটা শক্তি থাকে, এটাকে আত্মাই বল আর যাই বল মৃত্যুর সময় এটা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এর ফলেই দেহের ওজন কমে।

কমল হেসে বলেছিল অন্য কারণেও তো কমতে পারে ওজন। যে কারণটা এখনও আমরা জানি না, হয়তো পরে জানব।

আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম—না, অন্য কোন কারণ নয়। অন্য কোন কারণ যাতে এর মধ্যে মাথা গলাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পরীক্ষা করা হয়েছিল।

কমল তবুও আমার কথা স্বীকার করতে চায়নি। আসলে ও কিছুটা গোঁয়ার। ওর ধারণা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের বাইরে কিছু থাকতেই পারে না। ওর সঙ্গে আমার কোনদিনই হয়তো মতের মিল হবে না।

বিকাশ অবশ্য সে ধাঁচের নয়। ও আমাকে বিশ্বাস করে। তাই প্লানচেট করার সময় ওকেই সঙ্গে নিয়েছি। একটা গোল ছাপ আঁকা হয়েছে মেঝেতে চকখড়ি দিয়ে। দাগের গা বরাবর ইংরেজীতে A, B, C, D.....Z লেখা হয়েছে। গোল দাগের

মাঝ বরাবর একটা কাপ উল্টিয়ে রাখা হয়েছে। কাপের ওপরে আমরা একটা করে আঙ্গুল রেখেছি।

কিছুক্ষণ একমনে মার মূর্তি চিন্তা করলাম দুজনে। মার মূর্তি এখনও স্পষ্ট! সেই মায়াভরা চোখ, চওড়া কপাল, সাদা সাদা চুল, গালে টোল পড়া। মার হাসিমুখ কিছুতেই মনে আসছে না। মুখটা কেমন দুঃখী মনে হচ্ছে। বুকের ব্যথাটা আবার বুঝি টনটন করে উঠলো।

কতক্ষণ এরকম অবস্থায় ছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখি কাপটা ঠকঠক করে কাঁপছে! তবে কি মার আত্মা এসেছে কাপের ভেতরে! জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি আমার মার আত্মা?

কাপটা হটাৎ দেখি Y অক্ষরের দিকে এগুচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বিকাশ আঙ্গুল দিয়ে ঠেলছে নাকি কাপটা! বোঝার উপায় নেই। কাপ ইতিমধ্যে Y অক্ষরের পরে E এবং তারও পরে S এ গিয়ে থেমে গেল। তবে তো উত্তর YES অর্থাৎ হ্যাঁ। তাহলে আমার মা'ই এসেছে কাপের ভিতরে। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। গায়ের মধ্যে কেমন শিরশির করে উঠলো। জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছ? ততক্ষণে কাপের ঝাঁকুনি থেমে গিয়েছে। কাপ নিশ্চল। নড়ছে না দেখে আবার জিজ্ঞেস করলাম—কেমন আছ বল। কাপ তবু নিথর।

অনেকবার কাকতিমিনতি করলাম। অনেকবার জিজ্ঞেস করলাল। কাপ তবু নড়লো না। বিকাশ আঙ্গুল তুলে বললো—আত্মা বেরিয়ে গেছে।

তারপরে আবার চেষ্টা করলাম প্লানচেট করার। কিন্তু কাপ আর নড়লো না। হায়রে! মা এলো, তবু সে কেমন আছে জানতে পারলাম না। হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তাই আত্মা বেরিয়ে গেছে।

বিকাশ বললো—আচ্ছা স্নু, তুই প্রথমবার কাপ ঠেলিস নিতো!

বললাম আমিও তো তোকে সেই কথাই জিজ্ঞেস করবো ভাবছিলাম।

বিকাশ বললো—তবে এটা কি করে সম্ভব হ'লো ?

আমি বললাম—মারা যাওয়ার সময় যে শক্তি দেহ থেকে বেরিয়ে যায় তাকে একমনে চিন্তা করলে যেখানে সেখানে খুশী আনা যায়। কাপের মধ্যে আনা যায়। কোন মানুষের মধ্যে আনা যায়। জানিসইতো চিন্তা, ভাবনা কতকগুলো বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকারে মাথাতে খেলে এবং তার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশও হয়। এভাবেই সাদা কাগজে আমের চিন্তা করলে আমের ছবি ফুটে ওঠে। এভাবেই আত্মার কথা চিন্তা করলে আত্মা প্রকাশ পায়। মানুষকে মিডিয়াম করেও আনা যায়। সেই পথেই মার আত্মা আনার চেষ্টা করলাম। রুনু মানে আমার স্ত্রীও আমাদের পথের পথিক। ওকে মিডিয়াম করে ওর মধ্যে মার আত্মা আনার চেষ্টা করলাম। ও কথা বলে উঠলো—হ্যাঁ, আমি এসেছি। তখন রুনুকে সত্যিই অন্যরকম মনে হচ্ছিলো। এক্ষেত্রে মিডিয়ামকেই বেশী মনোযোগী হতে হয়। রুনু একমনে তার মধ্যে মাকে কল্পনা করতে তার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। তখন রুনুর আত্মার অস্তিত্বের ওপরে মার আত্মা প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম রুনুর মধ্যে যে শক্তি এসেছিল সে আমার মা নয়, অন্য আত্মা। রুনুর দেহ ছাড়ার সময় সে স্বীকাব করে যায় এ কথা।

রুনুকে পরে জিজ্ঞেস করলাম ওই অবস্থায় তোমার কিরকম মনে হয়েছিল? উত্তরে রুনু বলেছিল—ওই অবস্থার কথা কিছুই মনে নেই। তবে মার কথা চিন্তা করতে করতে সে এটুকু বুঝেছিল আস্তে আস্তে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর সে যেন এক অন্য অস্তিত্ব হয়ে যাচ্ছে। রেডিওতে যেমন তরঙ্গ ঘুরিয়ে বহুদূরের তরঙ্গ, বহুদূরের কথা ধরা যায় এখানেও হয়তো সেরকম মনের লেভেলকে

ঘুরিয়ে আত্মারূপী শক্তির তরঙ্গ ধরা সম্ভব। তখন সেই মিডিয়ামের মধ্যে অন্য আত্মারই প্রকাশ হয়।

ভুলে তো অন্য তরঙ্গও মাঝেমধ্যে ধরা পড়ে। তবে কি সত্যি সত্যিই অন্য আত্মা এসেছিল মার আত্মার বদলে। কিন্তু মার আত্মা ধরা যাচ্ছে না কেন!

হঠাৎ আমার গবেষণার কথা মনে পড়লো। মানুষের জীবন আসলে কতকগুলো ঘটনার সমষ্টি। কোন ঘটনাকে (X, Y, Z, T) এই চারটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়, যেখানে X, Y, Z কোন জায়গায় ঘটনা ঘটেছে তা নির্ণয় করে আর T কোন সময়ে ঘটনা ঘটেছে তা নির্ণয় করে। এরকম এক একটা ঘটনাকে এক একটা বিন্দু দিয়ে প্রকাশ করা যায়। কোন মানুষের জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাগুলোকে এক একটা বিন্দু দিয়ে প্রকাশ করে তার জীবনের রেখাচিত্র আঁকা যায়। একে বলে তার ওয়ারলড কার্ভ।

আচ্ছা মার জীবনের ঘটনাগুলো তো আমি মোটামুটি জানি। তবে তার জীবনের ছবি এঁকে ফেলি। রেখাচিত্রের সমীকরণ অর্থাৎ আংকিক চিত্রও পাওয়া গেল। এই সমীকরণ থেকে কোন জায়গায় কোন ঘটনা ঘটলে কত শক্তি বের হবে তাও বের করা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই ঘরের X, Y, Z ও কাল ত্বপুর বেলার সময় দেখছি মার জীবনের সমীকরণকে মানছে। মৃত্যুর পরে যদি সত্যিই কিছু থেকে থাকে তবে তো কাল ত্বপুরে মার আত্মা এই ঘরে আসবে। শুধু তাই নয়, সমীকরণ থেকে শক্তির পরিমাণ হিসেব করে দেখা যাচ্ছে কাল ত্বপুরে এখানে বেশ উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা ঘটবে। আর না হ'লে এত বিপুল শক্তি বেরুতে পারে না।

অস্থির মস্তিষ্কে কাটিয়ে দিলাম সে দিনটা। সময় যেন আর যেতেই চায় না। বিকাশকে কথাটা আগেই বলেছিলাম। বিকাশ ত্বপুরবেলা ঠিক সময়ে এসে হাজির। ঘরটাকে চারদিক থেকে এমনভাবে বন্ধ করে রেখেছিলাম যাতে অন্য কোন কারণে যেন

কোনরকম ঘটনা না ঘটে। সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলেছিলাম ঘর থেকে। দরজা জানালা বন্ধ করে দিলাম।

বিকাশ বললো—সব বন্ধ করে দিচ্ছিস, আত্মা আসবে কি করে? বললাম—এ শক্তির কোন বাধা নেই। এক্স-রে রশ্মি যেমন অনেক কিছু ভেদ করে যেতে পারে, এই আত্মার শক্তি এক্স-রের চাইতে অনেক বেশী। যে কোন জিনিস ভেদ করে যাবার ক্ষমতা আছে এর। সেদিন কাপের মধ্যে ঢোকাটা তো তুই নিজেই দেখছিস।

বিকাশ আর কিছু বললো না। কেমন চুপ করে গেল। বোধহয় ভয় পেয়ে গেছে। আমার গাটাও কেমন ছমছম করে উঠলো। শ্বাস কেমন বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো। একি হোলো আমার! যার আসার আশায় এতদিন ধরে দিন গুণছিলাম আজ তার আসার মুহূর্তে একি অস্থিরতা! একি অসারতা!

বিকাশ বললো—খুব ভয়ংকর ঘটনাও তো ঘটতে পারে, অত শক্তি যখন বেরুবে! আমি একথার কোন উত্তর দিলাম না। আসলে কি ধরণের ঘটনা ঘটবে তা আমিও বলতে পারছি না। ঘরে শক্তি মাপবার যন্ত্রও বসানো হয়েছে। সেই যন্ত্রে ধরা শক্তি আর মার জীবনের সমীকরণ থেকে হিসেব করে বের করা শক্তি এক কিনা তাও দেখতে হবে। এক হ'লে তবেই মৃত্যুর পরে তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হবে।

আমি বারবার ভাবছি কি ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। মা কি আমার কোন ক্ষতি করবে! নিশ্চয়ই না। তবু কেন জানি শরীর শির্‌শির্ করতে লাগলো।

এই অখণ্ড নীরবতার মধ্যে কতক্ষণ ছিলাম জানি না। হঠাৎ বাইরে থেকে রুনুর ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে। আরে! যে সময়ে ঘটনা ঘটার কথা ছিল সে সময় তো অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে! কিরকম হতাশভাবে দরজা খুলে দিলাম।

তা'হলে মার আত্মা এলো না। কিন্তু আমার গবেষণাকে

স্বীকার করতে গেলে তো তার এদিন এসময়ে এখানে একান্ত আসা উচিৎ ছিল! তবে! তবে কি মৃত্যুর পরে কিছু নেই! না, তা আমি বিশ্বাস করি না! আচ্ছা মা মারা গেছেন তো প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল। এর মধ্যে তো অন্যের মধ্যে সে আত্মা জন্ম নিতে পারে। তাহ'লে তাকে আর পাওয়া যাবে না।

কমল এসব শুনে হেসে বলেছিল—কিরে পেলিনা মাকে! উত্তরে কিছু বলতে পারিনি। তবে আমিও হারবার পাত্র নই। বলেছিলাম—শুনেছি আত্মা ডেকেও অন্য আত্মার খোঁজ নেওয়া যায়। বহু পুরনো আত্মা ডেকে নাকি অতীতের অনেক অজানা রহস্যও উদ্ধার করা সম্ভব।

কমল আবার হেসে বলেছিল—অতীতকে জানার তো অনেক বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। যেমন ধর মাটি খুঁড়ে কোন শিলালিপি পাওয়া গেল। শিলাপির পাঠোদ্ধার করে অতীতের অনেক অজানা তথ্য জানা যায়। শিলালিপির বয়স কত তাও পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। এভাবে পুরনো মূর্তি পেলেও বলা যায় মূর্তিটি কি ধাতুর। কতদিন আগের। অর্থাৎ সেই সময়ে সেই ধাতুর প্রচলন ছিল। ওখানে কোন মানুষের মাথার খুলি পেলেও সময়টা অর্থাৎ কতদিন আগের তা জানা যায়। কারণ মাথার খুলির আকার এবং আয়তনও সময় অনুসারে পরিবর্তিত হয়। অতীতকে জানার জন্য আত্মা! হুঁ, যতসব ধাপ্পাবাজি।

আমিও না দমে উত্তর দিয়েছি বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে অতীতকে জানা সম্ভব তা জানি। তাছাড়া যদি কোনদিন মানুষ আলোর চাইতে অনেক বেশী গতিবেগ নিয়ে বহুদূরের কোন গ্রহে পৌছুতে পারে তবে সেখানে গিয়ে হয়তো টেলিভিসনের সাহায্যে পৃথিবীর বহু পুরনো ঘটনা জানতে পারবে। কারণ সেসব ছবি আলো সেই গ্রহে পৌঁছে দেবার আগেই তারা সেখানে হাজির হয়েছে। তবে আমি সে আলোচনায় যাচ্ছি না। আমি বলতে চাইছি বহু পুরনো কোন আত্মা যা কোন দেহে আসেনি তাদের

ডেকেও অতীতকে জানা যায়, বর্তমানকে জানা যায়, পাওয়া যায় অন্য আত্মার খোঁজ-খবর।

কমল রেগে বলেছিল—ওসব তোর সায়েন্স ফিক্‌শনের লেখায় লিখিস।

দমে গিয়েছিলাম কিছুটা। পরাজিত মনে হতে লাগল নিজেকে। তর্ক থামিয়ে চলে এসেছিলাম সেদিন।

কিছুদিন হতাশার মধ্যে কাটালাম। তাহ'লে মার খবর পেলামই না। থেকে থেকে বুকের ব্যথাটা টনটন করে ওঠে। যখনই কারো কাছে অনাদর পাই, অবজ্ঞা পাই, তখনই তার কথা বেশী করে মনে পড়ে। মা আমাকে কত ভালোবাসতো। বিনিময়ে আমি তো তার জন্য কিছুই করতে পারিনি। এমনকি চাকরী-বাকরী করে, বিয়ে-থা করে তাকে নিয়ে যে একটু আমোদ-আহ্লাদে কাটাবো তাও আর হ'লো না। আঙুর খেতে কত ভালোবাসতো মা। সেই আঙুর তাকে ঠিকমতো খাওয়াতে পারিনি। তখন কতই বা মাইনে পেতাম। আর এখন এত স্বাচ্ছন্দ্য, অথচ মা এ স্বাচ্ছন্দ্যের কিছুই ভোগ করলো না। আঙুর ফল কেউ খেতে দিলে খেতে পারি না। মার কথা মনে পড়ে যায়। চোখে জল চলে আসে।

মন আমার আশাবাদী। জাতিস্মর নিয়ে আমি কিছুটা গবেষণা করেছিলাম! আত্মা মৃত্যুর পরে দেহ থেকে বেরিয়ে কিছু দিন বাদে জাতিস্মরের আকারেও দেখা দিতে পারে। এ কথাটা তো একদম খেয়াল হয়নি। আত্মারূপী শক্তি সমধর্মীয় খোলস বা দেহ বেছে নেয়। যদি সেই দেহের পরিবেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে তবে সেই মানুষটি জাতিস্মর হতে পারে। অর্থাৎ পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারে। আর যদি দেহের পরিবেশে প্রাধান্য বিস্তার না করতে পারে তবে সেই পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলে, তৈরী হয়। এভাবে আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হয়, পরিবর্তিত হয়।

জাতিস্মর নিয়ে গবেষণা করতে করতে মার কথা বারবার মনে হয়েছে। যেখানেই জাতিস্মরের কথা শুনেছি, সেইখানেই ছুটে গিয়েছি। বারাসতের একজন ছোট্ট মেয়ে নাকি পূর্বজন্মের কথা বলছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম সেখানে। ও বললো—ওর মা, বাবা নাকি বাংলাদেশে আছে। ওর বাবার নাম হীরালাল ব্যানার্জি। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সেই জায়গায় ছুটলাম, যে জায়গার কথা ও বলেছিল। সেখানে গিয়ে সত্যিই হীরালাল ব্যানার্জি বলে একজন স্কুল শিক্ষককে পেলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় নাকি সত্যি সত্যিই তার এক মেয়ে মারা যায় দাঙ্গায়। মার বিবরণও পুরোপুরি মিলে গেল। মিলে গেল অন্যান্য বিবরণ।

তার যে মেয়ে বাংলাদেশ হওয়ার সময় মারা যায় তার জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহ করেছিলাম হীরালালবাবুর পাশে বসে। বারাসতের মেয়েটির জীবনের রেখাচিত্র এঁকেছি! হীরালালবাবুর মারা যাওয়া মেয়েটিরও জীবনের রেখ চিত্র আঁকলাম। তারা একই শক্তি হ'লে ছুটো সমীকরণ থেকে বারাসতের ঐ জায়গায় ঐ সময়ে এক শক্তি বেরুনো উচিৎ। কিন্তু পুরোপুরি মিলছে না কেন এই শক্তির পরিমাণ! আগের যে সব জাতিস্মরের তথ্য সংগ্রহ করেছি সেখানেও মেলেনি এ হিসেব। তাহ'লে!

চিন্তায় মগ্ন আছি, হঠাৎ 'নাচু, নাচু' করে একটি ছোট্ট মেয়ে এসে আমার মাথায় হাত বুলোতে শুরু করলো। বললো—তুই কোথায় ছিলি এ্যাদ্দিন? আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে।

আমি অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। একি বলছে! 'নাচু!' নাচু তো আমার ডাকনাম। ও আমার নাম জানলো কি করে! হীরালালবাবুকে বললাম—এ কে? একে তো আগে কখনো দেখিনি মশাই। তবে এ আমার ডাকনাম জানলো কি করে?

হীরালালবাবু বললেন—আরে ওকে নিয়েই তো মুস্‌কিলে পড়েছি মশাই। বছর চার আগে জন্মালো।

—মানে আপনার মেয়ে!

—হ্যাঁ, আগের মেয়েটা মারা যাওয়ার পর এটাকে পেয়ে ভাবলাম আগের মেয়ের শোক কিছুটা ভুলে থাকা যাবে। কিন্তু কথা ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই বলা শুরু করলো—আমাকে এখানে আটকিয়ে রেখেছ কেন? আমার আট ছেলে, পাঁচ মেয়ে—সব পশ্চিমবঙ্গে আছে। বেশীর ভাগ ছেলেই আসানসোলে আছে। আর অধিকাংশ সময় 'নাচু, নাচু' করে।

আরও যা যা শুনলাম তাতে অবাক হয়ে গেলাম এই তো আমার মা। যে মাকে এতদিন ধরে পাগলের মতো খুঁজে বেরিয়েছি। যে মার জন্য অহরহ বুকে ব্যাথা টনটন করে। সব কথা মিলে গেছে। মেয়েটি যা যা বিবরণ দিল সব মিলে গেল। এমন কি এমন কতকগুলো ঘটনা যা শুধু মা আর আমিই জানি—তাও বলে দিল।

হীরালালবাবুকে বললাম—আমিই নাচু। আমিই ওর ছোট ছেলে ছিলাম। আসলে আমার মাই জাতিস্মর হয়ে আপনার ঘরে জন্ম নিয়েছে। সব মিলে গিয়েছে। সৌমি অর্থাৎ মেয়েটি বলে উঠল—কি তুইও অবিশ্বাস করছিলি? একবারও আমার কথা মনে হয়নি বলে কাঁদতে লাগলো।

আমি অস্থির হয়ে উঠলাম। এতদিনের সমস্ত ব্যথা, বেদনা, ব্যথামালা, মুক্তোমালা হয়ে নেমে এল চোখ দিয়ে অঝোরে কেঁদে ফেললাম আমিও,—না, মা আমি তোমাকে ভুলিনি। তোমার কথা প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমার মনে হয়েছে কি করে বোঝাবো তোমাকে মা একথা। রাতের বেলা একা শুয়ে শুয়ে কেঁদেছি। ভোরবেলা উঠে তোমাকে মনে পড়েছে, কেঁদেছি।

এতক্ষণে মেয়েটির মুখে হাসি ফুটলো—তা জানি, তুই কি আমাকে ভুলতে পারিস। আমাকে নিয়ে চল আসানসোলে।

*   *   *   *   *

অনেক চেষ্টা করলাম সৌমিমাকে একবার আসানসোলে নিয়ে আসতে। হীরালালবাবু কিছুতেই দিলেন না। একমাত্র মেয়েকে হারাবার পর একে পেয়েছেন। একে ছাড়ার কথা ভাবতেই পারেন না। ওনাকেও দোষ দিই না। তাছাড়া আইন তো ওনারই পক্ষে। সৌমির জীবনের সমীকরণ থেকে এবং আমার মার জীবনের রেখাচিত্র থেকেও হিসেব করে বের করা পরিমাণ এক হয়নি। তবু আমি নিশ্চিত যে সৌমি আমারই মা ছিল। চার বছর আগে সৌমির জন্ম। প্রতিটি ঘটনা মিলে গিয়েছে। আসলে খোসল পাল্টাবার সময়ই মনে হয় আত্মার কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়। যেমন একই তরঙ্গ দুটো আলাদা রেডিওতে দুরকম শোনায়, ঠিক সেরকম।

আসার সময় সৌমি তার সমস্তটুকু শক্তি দিয়ে আমাকে আটকাবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল—আমিও যাব। না, তার আর আসা হ'লো না। আইন, তাকে আসতে দিল না। জন্মান্তর তার বাধা হয়ে দাঁড়াল। আসার সময়ের কান্না আমার এখনো বুক ভেঙ্গে ফেলছে।

ট্রেনে উঠেও সে বেদনা কমেনি। কি করি আমি! নাঃ, ফিরে আমাকে যেতেই হবে। ওর কান্না হয়তো একদিন থামবে। জাতিস্মরের স্মৃতি বোশীদিন থাকে না, পরিবেশেই আস্তে আস্তে তাকে পাল্টে ফেলে। পরিবেশই প্রাধান্য লাভ করে ধীরে ধীরে। কিন্তু আমি! আমি কি করব! আমার সত্ত্বা তো পুরোপুরি তৈরীই হয়ে গিয়েছে। আমি তো আর পাল্টাব না। আমার তো আর পাল্টাবে না মন। স্মৃতি তো মোছা যাবে না। স্মৃতি মোছা

যাবে না কোনদিন। এমন যে পুরোপুরি ভেঙ্গে গেল। এমন তো আর কোনদিনই জোড়া লাগবে না। প্রতিদিন প্রতি প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে পড়বে সৌমি মার দ্রারিদ্র্যের কথা, কষ্টের কথা, কান্নার কথা। সৌমিমাকে দেখে যে কান্নার বরফ গলতে শুরু করেছিল, আবার তা জমা শুরু করেছে। চোখের জল শুকিয়েছে, কিন্তু বুকটা আবার ভারি হয়ে উঠেছে। জানি, যতদিন বাঁচব এই ব্যথার বোঝাটা বয়ে চলতেই হবে। এর থেকে নিস্তার নেই, পরিত্রাণ নেই।

●